সনাতন-ধর্ম্ম

ও

মানব-জীবন।

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্য
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং।

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত।

গারোহিল-"যোগাশ্রম" হইতে
সেবক নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ঢাকা, ১৩৮নং নবাবপুর, জাহ্নবী-প্রেস।
প্রিণ্টার—শ্রীলালচাঁদ নাগদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।
১৩২৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ—

এই পুস্তক কলিকাতা ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট স্থিত ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্ এর দোকানে এবং আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীদেবেন্দ্রলাল সরকার।

৺জগবন্ধু সরকার মহাশয়ের বাসা।

ময়মনসিংহ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

উৎসর্গ !

যাঁহার অহেতুক কৃপাতে
এই মায়ামুগ্ধ মোহলুব্ধ ভ্রান্ত দীনের

জীবন

মায়ামোহযুক্ত মরীচিকাময় বিষয়াসক্তির
দিক হইতে ফিরিয়া,
সচ্চিদানন্দের দিকে
আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়াছে, আনন্দ-
কন্দ পরমদয়াল জ্ঞানময় সেই
ভগবান পরব্রহ্মের অতুল

পরম পদে

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায়
এই পুস্তকখানা
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সহ

অর্পিত

হইল।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল—যখন পবিত্র ভারতভূমি সেই প্রাচীন সভ্যতার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছিল—ভারতের প্রতিজনপদ, প্রতি পল্লী, বিশ্বপিতার জয় ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছিল!—যখন পর্ব্বত-কন্দরে নিবিড় অরণ্যে বসিয়া ভারতীয় ঋষিগণ পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন! ভারতের পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীতটে বসিয়া আর্য্যঋষিগণ জলস্থল নভোমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া সামগানে নিরত ছিলেন!—যখন গৌরবান্বিত ভারত-রবির উজ্জ্বল আলোকে বিশ্ব মানবের অজ্ঞান তমসা দূরীভূত হইয়া, বিশ্বের প্রাণ একমুখী হইয়া বিশ্বপিতার পাণে প্রেমভরে ছুটিয়াছিল, ভারতের সেই পুণ্যময় স্মরণীয় ঋষিযুগে, আর্য্যঋষিগণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা কোন বিষয়ই অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই, কিম্বা কিছুই অমীমাংসিত রাখেন নাই! ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জড়তত্ত্ব পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় সৃষ্টিতত্ত্বেরই চরম মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু মহাত্মা এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, ঋষি প্রকাশিত ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল সমস্যাগুলি, সহজ ও সরল ভাষায় মীমাংসা করিয়া দিয়া, মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয়ের পন্থা আরও সুগম করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমরা এমনই হতভাগ্য যে, সেই ঋষিপ্রদত্ত চির-শান্তিময় অমৃতপানে অমরত্বলাভ করা দূরে থাকুক, তৎপরিবর্ত্তে আমরা বিষ পান করিয়া ক্রমশঃ মরণের দিকেই অগ্রসর হইতেছি!

বিগত কয়েক বৎসর যাবত পুণ্যভূমি ভারতের তীর্থাদি পর্য্যটন ও সাধু মহাত্মাদিগের সঙ্গে বাস ইত্যাদির ফলে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা অনাদিপ্রবর্ত্তিত সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিতে যাওয়া মাদৃশ অকিঞ্চন ব্যাক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কিম্বা পঙ্গু হইয়া গিরিউল্লঙ্ঘন করার মত অসম্ভব! তবে যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয় পঙ্গুও গিরিউল্লঙ্ঘন করে, সেই পরব্রহ্ম ভগবানের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে! সুতরাং

তাঁহারই অভয় চরণযুগল স্মরণ করতঃ এবং ভারতীয় মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শাস্ত্রের দুরূহ ও জটিল তত্ত্বগুলি যথাসাধ্য সরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে; তবে শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে সকলেই একমত হইবেন এরূপ আশা করা যায় না—কেননা বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্র-মর্ম্ম অনেকেই অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন! সাধু মহাত্মাগণ শাস্ত্রার্থ ও তাৎপর্য্য যে ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারই আভাষ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে!

ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী সনাতন ধর্ম্মভাবপুষ্টির অনুকূল নহে, বরং এরূপ শিক্ষা দ্বারা অনেক সময়ে ধর্ম্মভাব নষ্ট হইয়া থাকে!—ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষার অভাবই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ! তবে চিরদিন কখনও সমান যায়না, তাই বর্ত্তমানে সকল বিষয়েই একটা জাগরণের ভাব ভারতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যঋষিগণ অমৃতময় ফলরাশি ও অতুলনীয় পুষ্প-সম্ভার দ্বারা সনাতন-ধর্ম্মরূপ কল্প-কানন পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন! ভারতের এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে, সেই অমৃতপূর্ণ কল্প-কানন হইতে কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্প চয়ন করতঃ আজ আমার স্বদেশবাসীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম!!

এই গ্রন্থে মানব-জীবনের প্রাথমিক অবস্থা হইতে চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থাগুলিকে চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে; মানব-জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব লাভ, দ্বিতীয় দেবত্ব, তৃতীয় ঈশ্বরত্ব ও পরিশেষে চরমলক্ষ্য ব্রহ্মত্ব লাভ! এই চারিটী অবস্থা পরস্পর বিভিন্ন নহে, বরং সোপানাবলীর মত পরস্পর সংলগ্ন ও সমুন্নত অবস্থা মাত্র। অধিকারভেদে যে কোন একটী অবস্থা হইতে অগ্রসর হইয়া, চরম অবস্থায় উপনীত হইতে কোন বাধা নাই! সমাজের হিতকল্পে, সনাতন-ধর্ম্মের কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় তত্ত্ব, পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইল। সত্তর্কতা

গ্রহণ করা সত্বেও গ্রন্থের কোন কোন স্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, সুধীগণ ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে এই গ্রন্থ পাঠে যদি একটী লোকও উপকৃত হয়, তবে শ্রম সার্থক মনে করিব।

কয়েকটী বিশিষ্ট বন্ধু এই গ্রন্থ প্রণয়ণে বিশেষভাবে আমাকে অনুরোধ করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গারোহিল "যোগাশ্রমের" নিকটবর্ত্তী কোদাল ধোয়া ও ঝিক্ ঝাক্ গ্রামবাসী ভগবদ্ভক্তগণের আগ্রহ ও উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাহাদের সরল স্বর্গীয় ব্যবহারে আমি বড়ই মুগ্ধ; জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা, তিনি এই সরল বালকগণকে, তাঁহার চির-শান্তিময় কোলে তুলিয়া লইয়া প্রেমানন্দ প্রদান করুন। এক্ষণে জগত আরাধ্য জগত পিতা পরমেশ্বরের চরণ যুগল স্মরণ করতঃ আমার নিবেদন শেষ করিলাম।

ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমোনমঃ॥

—গ্রন্থকার।

প্রকাশকের নিবেদন।

বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মগ্রন্থের অভাব নাই, লেখকেরও অভাব নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহার যেরূপ মত বা অভিরুচি, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রাযন্ত্র ও বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সমাজে অবাধে চালাইতেছেন; ইহাতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ক্ষতি ও অসুবিধা হইতেছে—কেননা ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কঠিন সমস্যাগুলির সরল মীমাংসা না হইয়া, ক্রমেই উহা আরও জটিল হইয়া পড়িতেছে। বাণীর কৃপাতে গ্রন্থ-রচনায় যিনি যতই লিপিকুশলতা দেখাইতে সক্ষম হউন না কেন, তথাপি সাধন সম্পন্ন ও তত্ত্বদর্শী লোক ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা কেহই করিতে পারিবেন না, কিম্বা করিলেও তাহা প্রাণস্পর্শী হইবে না। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক পূর্ব্বে ময়মনসিংহ-জজকোর্টের

একজন সমুন্নত ব্যবহারজীব ছিলেন! যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করতঃ উদাসীন ভাবে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত তীর্থবাসে, সাধুসঙ্গে ও শাস্ত্রালোচনায় কাল কাটাইয়াছেন, এবং গারোহিল "যোগাশ্রমে" কয়েক বৎসর সাধন অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং হরিদ্বারের কুম্ভমেলা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাঁহারই লেখনী প্রসূত।

গ্রন্থকার বিগত বৎসর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথির সুপ্রসিদ্ধ হরিসভার বাৎসরিক উৎসবের সময়, স্থানীয় লোকের অনুরোধে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করতঃ "মানব জীবনের উদ্দেশ্য" নামক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতা শ্রবণে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবেগভরে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রদ্ধেয় স্বামীজি হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ সমস্তই বিশদরূপে বলিয়াছেন, আমার বলার আর কিছুই নাই! তাঁহার বক্তৃতা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই পুলকিত হইয়াছেন, তিনিই হিন্দুধর্ম্মে গৌরব অনুভব করিয়াছেন!—তিনি যে হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব মালা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারই রচিত সেই মাল্যের দুএকটী কুসুম লইয়া আজ আলোচনা করিব!" ইত্যাদি। এই বক্তৃতাটী মুদ্রিত করারজন্য বহু বিশিষ্ট লোক গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও সমাজের হিতকল্পে, গ্রন্থকার উপরোক্ত বক্তৃতা এবং কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্ম বিষয় অবলম্বনে এই পুস্তকখানা লিখিয়া আমাদিগকে ইহা প্রকাশের জন্য ভার দিয়াছেন। এক্ষণে সুধীগণের নিকট ইহা সমাদৃত হইলে সুখী হইব।

"যোগাশ্রম"—গারোহিল।
৺রাস পূর্ণিমা।
১৩২৬ সাল।

ভক্ত পদরেণু ভিখারী
দীন—
গারোহিল যোগাশ্রমের সেবকবৃন্দ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরত্ব।

"হরি ওঁ তৎসৎ"

সনাতন-ধর্ম্মে মানব-জীবন।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্যত্ব।

সত্যং শিব-সুন্দরং প্রসন্নং জ্ঞান-বিগ্রহং।
করুণা নিলয়ং শান্তং মহেশ্বরং নমাম্যহং॥

সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করা আবশ্যক, এজন্য সর্ব্বাগ্রে জগদ্গুরু জ্ঞানমূর্ত্তি করুণা-পারাবার দেবাদিদেব মহেশ্বরের অভয় চরণ সরোজে প্রণিপাত করিলাম।

মনুষ্যত্ব বিচার করিতে হইলে, মনুষ্য কি? কাহারা মনুষ্য নামের যোগ্য, মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি, এই সকল বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। শ্রীভগবান উত্তর গীতায় বলিয়াছেন,—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভি র্নরাণাং।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এই সমস্ত কার্য্যই পশু পক্ষী ও মনুষ্যদিগের মধ্যে সমান দেখা যায়, জ্ঞানই মানবগণের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, সুতরাং জ্ঞানশূন্য হইলে তাহারা পশুর সমান সন্দেহ নাই।

মানুষ যদি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন প্রভৃতি পশুভাবগুলি লইয়াই শুধু ব্যস্ত থাকে, তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি? কিসে মানুষ মানুষ নামের যোগ্য? বিধাতা কেন মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করিয়া পশ্বাদি হইতে বহু উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন? কেন মানব-জনম অতিশয় দুর্লভ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন? এই সকল প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয়, ইহার সহজ ও সরল মীমাংসা আছে। ভগবান মানুষকে এমন কতকগুলি গুণ দিয়াছেন যাহাতে মানুষ মানুষ নামের যোগ্য, যাহাতে মানুষ পশু হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। আমরা যখন বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, দয়া, সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য্য, সংযম প্রভৃতি সৎগুণগুলি মানুষে বিকশিত দেখিতে পাই, তখন কেন যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না। পক্ষান্তরে আবার যখন আমরা স্বার্থপরতা, অবিবেক, অজ্ঞানতা, হিংসা, দ্বেষ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি পাশবিক গুণগুলির বিকাশও কোন কোন মানুষে দেখিতে পাই, তখন মানুষ প্রকৃতই মানুষ কি পশু এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় ভগবানের রাজ্যে এই প্রকার বৈষম্যের কারণ কি? মানব জাতি যদি সৃষ্টির উচ্চতম স্তরে অবস্থিত তবে তন্মধ্যে আবার নরাকার-পশু দেখিতে পাই কেন? এবিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবগণ কিরূপে ক্রমোন্নতিতে উদ্ভিজ্জাদি নিম্ন স্তর হইতে মানবীয় উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, এই সকল বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

এই জগতের যাবতীয় জীবশ্রেণী চারিস্তরে বিভক্ত; প্রথম স্তর উদ্ভিজ্জ,

দ্বিতীয় স্বেদজ, তৃতীয় অণ্ডজ, চতুর্থ জরায়ুজ। প্রকৃতির প্রথম স্তরে জীবগণ বৃক্ষলতাদিরূপে জন্মিয়া থাকে, ক্রম বিকাশে তাহারা এই স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়, তখন জীবগণ স্বেদ অর্থাৎ জল বা লালা হইতে উৎপন্ন হয়। জল সংযুক্ত কোন দ্রব্য পচিয়া গেলে ঐ প্রকার জীব দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথবা কোন কোন বৃক্ষের পত্রে প্রথমতঃ লালার মত এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎপর ক্রমশঃ ঐ লালা হইতে শত শত কীটের উদ্ভব হইয়া থাকে, উহারাই স্বেদজ শ্রেণীভূক্ত। এই স্তর হইতে জীবগণ প্রকৃতির তৃতীয় স্তর অণ্ডজ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব মধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরিশেষে প্রকৃতির চতুর্থ স্তর জরায়ুজ শ্রেণীতে জীবগণ উন্নীত হয়, এই অবস্থায় মাতৃগর্ভস্থিত জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রাণীগণ সৃষ্ট হইয়া থাকে। *

প্রকৃতির চারি স্তর।

---

* "প্রধানা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা
উক্তশ্চতুর্ব্বিধা সোঽয়ং গিরিরাজ নিবোধমে
অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈব উদ্ভিজ্জশ্চ জরায়ুজঃ॥
অণ্ডজাঃ পক্ষী সর্পাদ্যাঃ স্বেদজা মশকাদয়ঃ
বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতয়শ্চোদ্ভিজ্জা হি বিচেতনাঃ
জরায়ুজা মহারাজ মানবাঃ পশব স্তথা
শুক্র শোণিত সম্ভূতো দেহ জ্ঞেয়ো জরায়ুজঃ॥"

ভগবতী গীতা

হে গিরিরাজ আপনি আমার নিকট জ্ঞাত হউন, উপরোক্ত পঞ্চভূত মধ্যে প্রথমভূত থবারই অধিক ভাগ অবশিষ্ট চারিটী ভূতের সহযোগে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও রায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ উৎপাদন করে। হে মহারাজ তন্মধ্যে বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতি দ্ভিজ্জ, মশকাদি স্বেদজ, পক্ষী সর্পাদি অণ্ডজ, আর মনুষ্যগণ ও পশু সমূহ জরায়ুজ; ই জরায়ুজগণের দেহ শুক্র শোণিত হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে।

প্রকৃতির এই চারিটী স্তর প্রত্যেক জীবকে অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, তৎপর জরায়ুজ শ্রেণীতে চরম উন্নতি লাভ করিলেই মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়।†

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই ক্রমোন্নতি বাদ (Evolution Theory) স্বীকার করিয়া থাকেন। উদ্ভিদ হইতে পশ্বাদি জন্ম পর্য্যন্ত জীবগণের বিবেক বিকশিত না হওয়ায় তাহারা ভালমন্দের বিচার করিতে সক্ষম হয় না, এজন্য তাহাদের কোন প্রকার পাপ পূণ্য নাই। পাপ পূন্যের অভাব হেতু তাহাদিগকে কোন প্রকার কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না; প্রত্যেক জন্মের পর তাহারা আবার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পরবর্ত্তী উন্নত জন্ম প্রাপ্ত হয়। মানব জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবগণের এই অবস্থা; তাহাদের ভালমন্দ ও প্রতিপালনাদির যাবতীয় ভার প্রকৃতির উপর ন্যস্ত।

এই প্রকারে জীবগণ যখন পশু হইতে সর্ব্বপ্রথম মানব জন্ম প্রাপ্ত হয়

---

† "স্থাবরং বিংশতি লক্ষং জলজং নব লক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশ লক্ষং পশূনাং চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্ব মুপজায়তে।
সর্ব্ব যোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্ম যোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥"

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

জীব বিশ লক্ষ বার স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষ লতা গুল্ম ঔষধি প্রভৃতি, নয় লক্ষবার জলজ, নয় লক্ষবার কূর্ম্মাদি, দশ লক্ষবার পক্ষী, ত্রিশলক্ষবার পশু প্রভৃতি, চারি লক্ষবার বানরাদি জন্মের পর মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে; মনুষ্যের মধ্যেও বহু জন্ম ভ্রমণান্তর জীব দ্বিজত্ব লাভ করে, পরিশেষে সর্ব্বযোনি পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্ম যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ বা মুক্তি হয়।

তখন তাহাদের স্বভাব পূর্ব্বজন্মের ভাব বা সংস্কারগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না; অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে পাশবিক ভাবগুলি বেশ বিদ্যমান দেখা যায়। এই শ্রেণীর লোকগুলি আকারে মনুষ্য হইলেও ভিতরে পশু প্রকৃতি সম্পন্ন; ইহাদিগকে নরাকার পশু বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এস্থলে পশু প্রকৃতির একটি সর্ব্বজন দৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করিলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পশু ভাবের দৃষ্টান্ত।

কুকুরের স্বভাব আলোচনা করা যাউক; স্বার্থ হানির সম্ভাবনা হইলে কিম্বা তাহার আহার্য্যে কেহ ভাগ বসাইতে আসিলে, পরস্পর যতই ভালবাসা হউকনা কেন, মা বেটাতেও ভীষণ ঝগড়া বা লড়াই লাগাইয়া দিবে! ইহাও তত দোষের নয়, কেননা স্বার্থান্ধ হইলে মানুষের পক্ষেই যখন অসম্ভব কিছুই নাই, প্রাণ বিসর্জ্জনও যখন মানুষের পক্ষে অতি তুচ্ছ, তখন পশুতে এভাব বিদ্যমান থাকা মোটেই দোষের নয়। যাহা হউক যেখানে কোন প্রকার স্বার্থের সম্বন্ধ নাই এমত স্থলে কিরূপ ভাব তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। একটা অপরিচিত কুকুর যেন সদর রাস্তা দিয়া যাইতেছে, সে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিতেছেনা কিম্বা কোন প্রকার স্বার্থের সংশ্রব অন্যের সহিত তাহার মোটেই নাই, শুধু সে আপন মনে গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে, এক্ষণে স্থানীয় কুকুরগুলি এই অবস্থায় একবার ইহাকে দেখিলেই হয় আর কি! পর মুহূর্ত্তেই ইহার যে কি ভীষণ অবস্থা হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বাকী আছে? স্থানীয় কুকুরগুলি ইহাকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বহুদূরে লইয়া যাইয়া, সমবেতভাবে নৃশংসরূপে আক্রমণ করিয়া প্রাণান্ত করিবে, তৎপূর্ব্বে ইহার আর নিস্তার নাই—যদি নেহাৎ পরমায়ুর জোর থাকে তবে বহু কষ্টে এই দস্যুদিগের কবল হইতে নিস্কৃতিলাভ করিতে পারিবে, নচেৎ এখানেই তাহার ভবলীলা শেষ হইবে।

এই অবস্থাটী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, এবম্বিধ পশুভাব যে নিতান্তই গর্হিত ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রকার পশুভাবের কতকটা বিকাশ কোন কোন মানুষেও বিদ্যমান দেখা যায়! আমি জানি কোন বাজারে ঘটনাক্রমে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষে মারামারি আরম্ভ হয়, তখন একটী লোক পরিচিত অপর একটী লোককে বলিতেছে, "ভাই তুই আমার বোঝাটা কিছুক্ষণের জন্য রাখ, আমি একটু 'হাতের সুখ' তুলিয়া আসি" এই বলিয়াই সেই লোকটা গোলমালের মধ্যে ঢুকিয়া, যাহাকে পারিল উত্তম মধ্যম বেশ প্রহার করিয়া ফিরিয়া আসিল। এক্ষণে এই লোকটার স্বভাবের সহিত উপরোক্ত কুকুরের স্বভাবের তুলনা হয় না কি?

যাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহারা কোন গোলমাল বা শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলেই, যাহাতে অচিরে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বিষয়ে প্রযত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাদের পশুভাব প্রবল তাহারা ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের পাশবিক ভাব বিকাশের সুযোগ প্রদান করিতে পারে সেই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের আকার বিশিষ্ট হইলেই মানুষ বলা যায় না। যখন দেখি কোন লোক স্বার্থ সাধনে রত হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, কোন ব্যক্তি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আশ্রিতের উপর অত্যাচার ও পীড়নে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত, অযথা পর পীড়নেই যাহার আনন্দ, পাশবিক অত্যাচারই যাহার জীবনের ব্রত ও ধর্ম্ম, এবম্বিধ লোককে কিরূপে মানুষ আখ্যা প্রদান করিব?—বুঝিতে হইবে ইহারা নূতন মানুষ, পশু জন্ম হইতে ইহারা মনুষ্য জন্মে মাত্র উন্নীত হইয়াছে, তাই পশুভাবগুলি এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, মনুষ্যত্বের বিকাশ এখনও হয় নাই সুতরাং এজন্য এইসব লোককে দোষ দেওয়া যায় না;

প্রাকৃতিক নিয়মে কর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমেই বিবেক জাগ্রত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে ইহাদেরও একদিন মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে, ইহারাও কোন কালে দেবত্ব ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্বে উপনীত হইবে !

প্রবৃত্তির তাড়নায় এই জগতের জীব সকল পরিচালিত হয়। সম্পূর্ণ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া পশুত্ব, কেননা আপন প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়ের উপর পশুর কোন প্রকার অধিকার নাই; যখন যে বৃত্তির উদয় হয়, অবিচারে সে সেই দিকেই ধাবিত হইয়া তাহাই চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে! তাহার পক্ষে দেশ কাল পাত্রের বিচার নাই, আপন প্রবৃত্তির উদ্দাম লালসা মিটানই একমাত্র লক্ষ্য এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মনুষ্যত্ব! মানুষ যখন যে বৃত্তির উদয় হয় তখনই তাহা চরিতার্থ করেনা, মানুষের বিবেক জাগ্রত, ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা ভগবান মানুষকে দিয়াছেন; মানুষের দেশকাল পাত্রাপাত্রের বিচার আছে, মানুষ প্রবৃত্তির স্রোতে সম্পূর্ণ গা ভাসাইয়া দেয়না, ইহাই মনুষ্যত্ব! এই খানেই পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের প্রভেদ ও শ্রেষ্ঠতা।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

সংযম মানবের ভূষণ ও জীবন। প্রবৃত্তির সংযমে মনুষ্যত্বের বিকাশ, তবে সংযমের পথটা নিতান্ত সহজ নহে, কেননা ইহা প্রবৃত্তির বিপরীত দিকে বল পূর্ব্বক যাওয়ার মত! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে জলস্রোতের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে; প্রবৃত্তি পথটা স্রোতের ভাটিপথ এই পথে চলিতে কোন বেগ পাইতে হয় না, একবার গা ভাসাইয়া দিলেই হইল, তবেই নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে আপনি নামাইয়া লইয়া যাইবে! আর নিবৃত্তি পথটা স্রোতের উজান পথ! চলা বড়ই কঠিন, একটা কিছু অবলম্বন ব্যতীত যাওয়া যায় না। সুবাতাস হইলে পথ কতকটা সহজ হয় বটে, কারণ পালের সাহায্যে যাওয়া যায়, কিন্তু সুবাতাস বা সেরূপ সৌভাগ্য আর কয়

জনের ভাগ্যে ঘটে? এজন্য অনেককেই গুণ টানিয়া বা নানাবিধ শ্রমজনক কার্য্য করিয়া অগ্রসর হইতে হয়! সুতরাং নিবৃত্তি পথটা যে কঠিন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই নিবৃত্তির কঠিন পথে যে যত অগ্রসর হইবে, তাহার ততই মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে, আর যে যত প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে, মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে সে তত পশুত্বের দিকে পতিত হইবে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কেহ কেহ অকৃতকার্য্য হয়; কোন অজানিত শক্তি যেন বলপূর্ব্বক তাহাকে অসংযত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া নিবৃত্তি বা সংযমের শত চেষ্টা বিফল করিয়া দেয়! ইহার কারণ কি?—এই শক্তিটি কে? এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়, এবিষয়ে দার্শনিক যুক্তি ও মীমাংসা আছে।

এই জগতে দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত বৃহৎ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। একটী "বহিরঙ্গা মায়াশক্তি" ইহার প্রভাব এইরূপ যে, ইহা জাগতিক জীবমাত্রকেই স্বরূপ বা ভগবান হইতে দূর হইতে আরও দূরান্তরে লইয়া যায়, অন্তর্ম্মুখী হইতে না দিয়া বাহিরে বাহিরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়! মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে স্থিরতা না দিয়া আরও চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে! প্রকৃত সত্যকে বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করাইয়া অপ্রকৃত ও মিথ্যাকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণ করাইয়া লয়! এই মায়াকে শাস্ত্রকারগণ "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা সাধারণতঃ ঘটে না, তাহাই ইনি ঘটাইতে পারেন, ইনি মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত করাইতে পারেন। এই জগত স্থিতির কার্য্যে ইহার ক্ষমতা অসীম। "আমি" জন্মের

"বহিরঙ্গা মায়াশক্তি"
"অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি"
"কুটস্থা জীব শক্তি"

পূর্ব্বেও ছিলাম, আবার মৃত্যুরপরেও থাকিব, ইহা ধ্রুব সত্য, কেননা আত্মা অজর, অমর, নিত্য সত্যস্বরূপ। কিন্তু এই ধ্রুব সত্যকেও মায়া আপন প্রভাবে মিথ্যা করিয়া রাখিয়াছেন! পরকালের জন্য মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তিত হইতে দিতেছেন না, সে বিষয়ে কোন চিন্তা মনে উদিত হইতেছে না! পক্ষান্তরে যাহা ধ্রুব মিথ্যা, অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থা, যাহা সম্পূর্ণ বিকারপূর্ণ ও অনিত্য, যাহার কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই!—যাহার অনিত্যতা আমরা প্রতিদিন কালচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত জীবকুলের আত্মীয় বান্ধবগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনিতে মর্ম্মে মর্ম্মে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি, সেই ধ্রুব মিথ্যার অবস্থাকেও আমরা এই মায়াশক্তির প্রভাবে চিরস্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছি! এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই মিথ্যার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; ধন্য মায়া;—ধন্য তোমার প্রভাব!

এই জগতে ক্রিয়াশীল, ভগবানের দ্বিতীয় শক্তির নাম "অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি"। এই শক্তিটী ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবগণকে শান্তির সুশীতল জলে স্নাত করাইয়া, প্রেমামৃত দানে অমর করিবার জন্য ভগবানের করুণাধারা-রূপে প্রকটিত! এই শক্তি মায়ার ভীষণ কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য, মায়ার বিরুদ্ধে সতত দ্বন্দ্বে নিয়োজিত। যেখানে দেখিব মানুষ মায়া প্রলুব্ধ প্রবৃত্তি পথ পরিত্যাগ করতঃ নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেখানেই বুঝিব ইহা চিৎশক্তির প্রভাব!—যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে পাইব, সেখানেই বুঝিতে হইবে ইহা চিৎশক্তির কার্য্য!—যখন দেখিব কেহ বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিম্বা ভগবানের ধ্যানে তৎপর অথবা ভগবন্নামগানে মাতোয়ারা, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, চিৎশক্তির সফলতায় মায়াশক্তি এখানে পরাজিত হইয়াছে। চিৎশক্তি সর্ব্বদাই মায়া শক্তির বিপরীত

আচরণ করিতেছে। মায়া শক্তি জীবগণকে যেরূপ সত্য হইতে দূরে নিতে চেষ্টা করিতেছে, চিৎশক্তিও সেইরূপ জীবকে সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে, আত্মস্বরূপের দিকে সতত টানিতেছে! মায়াশক্তি জীবের বৃত্তিগুলিকে বহির্ম্মুখী করিতে চায় কিন্তু চিৎশক্তি ঐ সকল বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে প্রয়াস পায়। মায়াশক্তি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করে, কিন্তু চিৎশক্তি মিথ্যার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সত্যকে বাহির করিয়া দেয়। এক কথায় চিৎশক্তি সর্ব্বদা মায়াশক্তির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করিতেছে; এজন্য চিৎশক্তিকে ভগবানের "দয়াশক্তি" বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে জীবগণের উপর মায়া ও চিৎশক্তির প্রভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মায়াশক্তির বিরুদ্ধে চিৎশক্তি সতত ক্রিয়াশীল; পরস্পর বিরোধী এই শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বেরফলে একটী তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দ্বন্দ্বেরপরিণামস্বরূপ * এই তৃতীয় শক্তিটীর শাস্ত্রীয় নাম "কুটস্থা জীব শক্তি"; এই জীব শক্তির ইঙ্গিতেই জগতের যাবতীয় জীবগণ পরিচালিত হয়। এই জীবশক্তি প্রত্যেক মানবে পরিস্ফুটরূপে বিরাজমানা।

যাহারা পশু হইতে নূতন মানুষ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে চিৎশক্তির প্রভাব সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত, কিন্তু মায়াশক্তির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল; এজন্য তাহারা চিৎশক্তির ক্ষীণকণ্ঠের অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ মায়াশক্তির প্রবল আহ্বানে উৎফুল্ল হইয়া প্রবৃত্তি পথে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মজন্মান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ যতই মনুষ্যত্বেরদিকে অগ্রসর হয়, ততই মায়াশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পরে, আর চিৎশক্তি আপন প্রভাবে মায়াকে পরাজিত করিয়া দীপ্তি পাইতে থাকে! একটী সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য

* বৈজ্ঞানিকেরা দুইটী পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের পরিণামফলকে "পরিণামশক্তি" (Resultant force) নাম দিয়াছেন।

কথা এই যে "সত্য" যতই ক্ষুদ্র বা দুর্ব্বল হউক না কেন তাহা একদিন মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া আপন গৌরবে উদ্ভাসিত হইবে! আর "মিথ্যা" যতই বলশালী হউক না কেন একদিন সত্যের নিকট পরাজিত হইবে! সেইরূপ চিৎশক্তি যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, একদিন মায়াশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার নিশ্চয় করিবে! আর মায়াশক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, একদিন চিৎশক্তির নিকট পরাজিত হইবেই হইবে।

যেখানে দেখা যায় কোন ব্যক্তি সংযমের বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে, মায়াশক্তির কিঞ্চিৎ প্রভাব এখনও আছে, তবে উহা অবিলম্বে চিৎশক্তির নিকট পরাস্ত হইবে কেননা চিৎশক্তির প্রভাবেই সংযমের চেষ্টা আসিয়াছে! যেখানে চেষ্টা ও অধ্যবসায়, সেখানেই সাফল্য। সুতরাং ঐপ্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। উৎসাহ ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে অচিরেই সফলতা আসিবে এবং সংযম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শান্তি প্রদান করিবে।

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল তাহাতে ক্রমোন্নতিতে মনুষ্য জন্মলাভ, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব, চিৎশক্তির প্রভাবে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর ইত্যাদি বিষয় প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে মনুষ্যত্বলাভের উপায় কি, এসম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্যত্ব লাভের উপায়

আর্য্যঋষিগণ অধিকারভেদে বিভিন্নশাস্ত্রে বহুপ্রকার সাধনার উল্লেখ করতঃ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পাতঞ্জলোক্ত যম নিয়মের সাধনা প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। মানব জীবনে প্রবৃত্তির

কি ভীষণ প্রভাব, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে; এই স্বেচ্ছাচার স্বভাবসম্পন্ন প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে, কতকগুলি বিশেষ নিয়ম সংযমের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, নচেৎ প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি আনা বড়ই কঠিন। এই নিয়ম সংযমই মহাত্মা পতঞ্জলি নির্দ্দিষ্ট "যম নিয়ম।" ইহাই সংক্ষিপ্ত ভাবে এস্থলে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

"অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাঃ যমাঃ"

পাতঞ্জল

অর্থাৎ অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাচটী সাধনার নাম **"যম"**—যম অর্থ আত্মসহিষ্ণুতা।

অহিংসা—কায়মনোবাক্যে হিংসা পারত্যাগের নাম অহিংসা। কায়িক হিংসা, বাচিক হিংসা ও মানসিক হিংসা এই ত্রিবিধ হিংসা পরিত্যাগের নাম অহিংসা। কায়িক হিংসা কি? নিজ শরীর দ্বারা অপর কোন জীবের হিংসা বা উৎপীড়ন উপস্থিত না করা। অনেক সময় দেখা যায় হাস্যতামাসাচ্ছলে কেহ কোন পশুপক্ষী বা কীট পতঙ্গাদিকে উৎপীড়ন করিয়া ভীষণ ক্লেশ প্রদান করে। এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে; কেহ কোন পাখীর গলায় বাশের "চোঙ্গা" পরাইয়া আমোদ করিয়া থাকে, কেহবা উহার ঠোট দুটী অথবা ডানা দুটী সজোরে বন্ধন করিয়া কিম্বা উহার ডিম্বগুলি ভগ্ন করিয়াও আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে! এই প্রকারে ভগবানের সাধের জীবকে হিংসা করা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

দ্বিতীয়তঃ বাচিক হিংসা, সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বাচিক হিংসা কি? কর্কশবাক্য দ্বারা অপরের ক্লেশ উৎপাদন করা। কোন কোন সময়ে মানুষ আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ আশ্রিতের উপর অযথা উৎপীড়ন ও সর্ব্বদা কর্কশ বাক্য প্রয়োগে তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া করিয়া তুলে!

একটী প্রবাদ আছে, "মিষ্ট কথায় জগত বশীভূত হয়," এই প্রবাদটীর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কেননা জোর জুলুমে বা অত্যাচারে মানবের মন বশীভূত করা যায় না, বরং সুযোগ পাইলেই ঐ প্রকারে আশু বশীকৃত মন প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। মিষ্টভাষীর নিকট জগত অবনত ও বশীভূত হয়। অপরের আশাপূর্ণ করার ক্ষমতা না থাকিলেও, একটী মিষ্ট কথা দ্বারাও তাহাকে সন্তোষ করা যাইতে পারে। মিষ্ট বাক্যের অসীম ক্ষমতা দূরে থাকুক, একটী মিষ্ট চাহনি দ্বারাও অপরের সন্তোষবিধান করা যায়। সুতরাং বাচিক হিংসা বর্জ্জন করতঃ সকলেরই মিষ্টভাষী হইতে অভ্যাস করা উচিত।

তৃতীয়তঃ "মানসিক হিংসা" সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য; বাহিরের ইন্দ্রিয়-গুলিকে চাপা দিয়া, যদি মনে মনে অপরের হিংসা করা যায়, তবে আর অহিংসা সাধন কিসে হইল? সুতরাং মন হইতে সর্ব্বপ্রকার হিংসার ভাব দূর করিতে হইবে। যখন হিংসার ছায়া মাত্রও মনে পতিত হইবে না, তখনই অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অপরজীবকে ঘৃণা করাও হিংসার অন্তর্গত। পাপীকে ঘৃণা করা উচিৎ নহে; শাস্ত্র পাপ বা পাপীকে উপেক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন* সুতরাং কাহাকেও ঘৃণা বা নিন্দা করা উচিত নহে।

---

* শাস্ত্রকারগণ যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটী ভাব অবলম্বন করার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। এই ভাব চতুষ্টয়ের দুই প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। প্রথম ব্যাখ্যা এই, এই জগতে সমান বয়স্ক সকলের সহিত মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রতা স্থাপন করিবে। তোমাপেক্ষা যাহারা ছোট অর্থাৎ যাহারা অধীন, কিম্বা হীন, তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে। গুরু বা শ্রেষ্ঠ জনের নিকট "মুদিতা" অর্থাৎ সন্তোষ বা প্রফুল্লভাব অবলম্বন করিবে, আর পাপীকে উপেক্ষা করিবে; অর্থাৎ পাপীর নিকট উদাসীন থাকিবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ, যথা—অপরের সুখ দুঃখ পাপপুণ্য দেখিলে যথাক্রমে উপরোক্ত চারিটী ভাব অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ অপরের পুণ্য দেখিলে সেই পুণ্যের সহিত মৈত্রী বা মিত্রতা করিবে। অপরের দুঃখ দেখিলে তাহাতে করুণা প্রকাশ করিবে। অপরের সুখ দেখিলে মুদিতা বা প্রফুল্ল হইবে; আর অপরের পাপ দেখিলে তাহা উপেক্ষা করিবে।

পরোপকারার্থে যথার্থ ভাষণের নাম সত্য। সত্যেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত, সত্যেই জগত ধৃত, ভগবান সত্যস্বরূপ, সুতরাং সত্যের মত বড় আর কিছুই নাই। মহামায়ারমোহে পড়িয়া একেইতো এই অনিত্য সতত পরিবর্ত্তনশীল মিথ্যারজগতে মুগ্ধ হইয়া, মিথ্যা অভিনয়েই কাল কাটাইতেছি! এইরূপ অবস্থায় পুনরায় মিথ্যাকে আশ্রয় করিলে, আরও কতদূর ঘৃণিত অবস্থায় যে অধঃপতিত হইতে হইবে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। পক্ষান্তরে যতই সত্যকে আশ্রয় করিতে পারিব, ততই সত্যস্বরূপ ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইব। সুতরাং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সত্য

সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বাকসংযম করা বিশেষ প্রয়োজন কেননা যাহারা বহুবালাপী তাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হয়। মিতভাষী হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অপ্রয়োজনীয় কথা মোটেই বলা উচিত নহে; এই প্রকারে বাক্যের সংযম অভ্যাস করিলে বাক্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাক্‌সিদ্ধি লাভ হইবে। সাধু মহাত্মাদের মধ্যে কাহারও বাক্‌সিদ্ধি হইয়াছে এরূপ কোন সময়ে দেখা যায়, ইহার কারণ এই যে তাঁহারা অনর্থক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না, সর্ব্বদাই, সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন এজন্য তাঁহারা যখন যাহা বলেন, তাহাই সিদ্ধ বা সত্য হয়।

পরদ্রব্য গ্রহণের অনিচ্ছার নাম অস্তেয়। অর্থাৎ পরের কোন একটী জিনিষ দেখিয়া সেই জিনিষ, অথবা সেই প্রকার একটী জিনিষ পাওয়ার লালসা জন্মিতে পারে, এই প্রকার লালসা পরিত্যাগের নাম অস্তেয়। এক কথায় পরদ্রব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ লোভ শূন্য হওয়ার নাম অস্তেয়। সময় সময় দেখা যায় অপরের একটী ভাল জিনিষ দেখিলে, ঐ প্রকার একটী জিনিষ নিজে সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি হয় না, ইহাতে ঐ জিনিষটী

অস্তেয়

যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করা হইল না, তথাপি পরোক্ষভাবে ঐ 'জিনিষটী পাইবার জন্য লালসা বলবতী হওয়ায়, অস্তেয় সাধনের ব্যাঘাত হইল। সুতরাং ঐ প্রকার লোভ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

ব্রহ্মচর্য্য সাধন।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ব্রহ্মচর্য্য বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য কি, তাহা জানা আবশ্যক। মহাত্মা পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"বীর্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্"।

অর্থাৎ শরীরস্থ চরম ধাতু শুক্রকে অবিচলিত ও অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

আমরা যাহা আহার করি তাহা পরিপাক হইয়া অসার অংশ মল মূত্রাদি রূপে নির্গত হয়, আর সারাংশ রসরূপে পরিণত হয়। এই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। দেহস্থিত সপ্ত ধাতুর চরম পরিণাম শুক্র; এজন্য শুক্রকে "চরম ধাতুও" বলা হইয়া থাকে। এই শুক্রই মানবের বল বীর্য্য ও জীবনী শক্তি। রসাদিসপ্ত ধাতুর তেজকে ওজঃ বলা হইয়া থাকে; সারভূত রসের স্থূলভাগ শুক্র এবং স্নেহময় সূক্ষ্মভাগই ওজঃ—ইহাই ব্রহ্মতেজ। এই তেজরূপ ওজঃ পদার্থ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও ইহার প্রধান আশ্রয় স্থান শুক্র; সুতরাং শুক্র নষ্ট হইলে তদাশ্রিত ব্রহ্ম-তেজও বিনষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই তেজকে

(Human Magnetism) দেহ রক্ষার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পদার্থের অভাব হইলে, দৈহিক বল বীর্য্য, স্মৃতি শক্তি, মেধা, উৎসাহ ধৈর্য্য, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন স্বীয় দেহ ভারও যেন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে! রসেরআকর মানব শরীর মরুভূমিতে পরিণত হয়! সুতরাং শরীর রক্ষার জন্যও ব্রহ্মচর্য্য পালন নিতান্ত প্রয়োজন। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন "Purity is Life, sensuality is Death" অর্থাৎ "পবিত্রতাই জীবন, আর স্বেচ্ছাচারিতাই মরণ।"

মহাত্মা পতঞ্জলি আরও বলিয়াছেন ঃ—

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্য লাভঃ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বীর্য্য বা মহতী শক্তি লাভ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে এই ব্রহ্মতেজ যতই সঞ্চিত হইবে ততই চিত্তের একাগ্রতা সাধন ও চিত্তশুদ্ধি সহজ সাধ্য হইবে। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত না হইলে নারী দেহেরও ব্রহ্মতেজ বা ওজঃ পদার্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের ফলে নরদেহে ব্রহ্মণ্য তেজ ও নারীদেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতি দীপ্তি পাইতে থাকে। ভারতের হিন্দু বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছেন! সর্ব্ববিধ সাধনায় মূল ব্রহ্মচর্য্য ; সাধন পথে কিছুমাত্রও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"ন তপস্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্"

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বোত্তম তপস্যা, ইহার তুলনায় অন্যান্য তপস্যা তপস্যাই নহে।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য পালন কিরূপে করিতে হয়, তৎবিষয়ে শাস্ত্রীয় মত কিঞ্চিৎ এখানে উল্লেখ করিব।

কর্ম্মনা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে॥

অর্থাৎ কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বত্র মৈথুন ইচ্ছা ত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য। শাস্ত্র মতে, মৈথুনের অষ্ট অঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ তৎ বিপরীত আচরণ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য, যথা—

শ্রবণংকীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং
সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিনঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

অর্থাৎ রতি বিষয়ক কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আটটী মৈথুনের অঙ্গ বলিয়া মনীষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন ইহার বিপরীত আচরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই ইহা আচরণ করা কর্ত্তব্য।

গৃহস্থগণ ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীগমন না করিলে, ব্রহ্মচারীরূপে গন্য হইতে পারেন! যথা—

"ভার্য্যাংগচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ।"

শান্তিপর্ব্ব—মহাভারত।

এপর্য্যন্ত যতদূর আলোচিত হইল তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইল, এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান কাল ও প্রাচীনকালের ব্যবহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব!

ভারতের অতীত স্বর্ণ যুগে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য মাত্রেরই জীবন চারিটী পবিত্র বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—

চারি আশ্রম।

(১) ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম (২) গার্হস্থ্য-আশ্রম (৩) বানপ্রস্থ-আশ্রম (৪) সন্ন্যাস-আশ্রম। সেই পবিত্র শুভ ঋষিযুগে, রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গুরুর আশ্রমে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনাদি প্রাথমিক সাধনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহারা গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ লাভ করিত। শিক্ষার সাফল্য হেতু, সংসারের অবশ্যম্ভাবী ঘাত প্রতিঘাতে তাহারা আত্ম-হারা বা লক্ষ্যচ্যুত হইত না। এই প্রকারে অনাসক্তভাবে গার্হস্থ-জীবনের পবিত্র ও দায়িত্ব পরিপূর্ণ কার্য্যাবলী সুসম্পন্ন করিয়া, যথাসময়ে উপযুক্ত পাত্রে সংসারের ভার অর্পণ করতঃ তাহারা বানপ্রস্থ-আশ্রমে প্রয়াণ করিত। বানপ্রস্থকে কেহ কেহ "বনে প্রস্থান" এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, সে যাহা হউক তীর্থ বাসাদি দ্বারা নির্লিপ্তভাবে গার্হস্থ্য-আশ্রম হইতে দূরে থাকাই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গৃহস্থাশ্রমকে "কাজলের ঘর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! কেননা এই ঘরে যে বাস করিবে, সে যতই সাবধান হউক না কেন, একটু না একটু কালীর দাগ লাগিবেই লাগিবে! বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য, গৃহস্থাশ্রমের ঐ দাগটুকু মুছিয়া ফেলা। বানপ্রস্থ-আশ্রমে বাস করিতে করিতে যখন তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইত, তখন তাহারা সন্ন্যাসাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই চিন্তামণির চিন্তায় চিত্তলীন করতঃ তাঁহারই নাম জপিতে জপিতে অন্তিমে তাঁহারই পরমপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিত।

বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাব হেতু পরবর্ত্তী তিনটী আশ্রমই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। "আশ্রম" কথাটী বড়ই পবিত্র ভাবোদ্দীপক! আর্য্যঋষিগণ গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত আশ্রম নামটী সংযোগ করিয়া কি পবিত্র

ভাবই মিশাইয়া দিয়াছিলেন! গৃহস্থ-জীবন কি পবিত্র কি সুন্দর ছিল! কিন্তু হায়,কালের পরিবর্ত্তনে আজ, গৃহস্থ-আশ্রমে প্রেত পিশাচের তাণ্ডবনৃত্য, স্বার্থময় কোলাহল, "ভাই ভাই ঠাই ঠাই", পরস্পর পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত, এবম্বিধ আসুরিক ভাব ব্যতিত পবিত্র ভাব বড়ই বিরল! ইহার মূল কারণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার অভাব। সুতরাং সমাজকে যদি পুনর্জীবিত দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে অচিরে ঘরে ঘরে ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। মূল পরিত্যাগ করিয়া ডাল পালায় জল ঢালিলে বৃক্ষ কখনও জীবিত হয় না! সুতরাং মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সকলেরই সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বাল্যকালে সাত্বিকভাব

বাল্যকালই ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রশস্ত সময়। মানব-জীবনকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধ। গুণময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণের বিকাশও এই তিন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রকাশ পায়! অর্থাৎ বাল্যকালে সত্বগুণের বিকাশ, যৌবনকালে রজগুণের বিকাশ ও বৃদ্ধকালে তমগুণের বিকাশ হইয়া থাকে। বালকগণ সত্বগুণ সম্পন্ন হওয়ায় তাহারা বিশ্বাসী, সরল, নিশ্চিন্ত, সদা প্রফুল্ল এই প্রকার স্বভাব সম্পন্ন হয়। যৌবনের সমাগমে, সেই সাত্বিকভাবগুলি রজগুণের আবির্ভাবে চাপা পড়িয়া যায়, তখন যুবকগণ রজগুণাত্মক কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়। তৎপর বৃদ্ধকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইয়া পরে, তখন তমগুণের উদয় হয়; আলস্য জড়তা বিমর্ষভাব ইত্যাদি তখন আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে! ইহাই সাধারণ নিয়ম, উপরে যে শুভযুগের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই ঋষিযুগে সাধনার প্রভাবে উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত! কারণ বাল্যকালে যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত,তাহাদের বাল্যকালের সাত্বিক ভাবটা সাধনার প্রভাবে বান্ধাপড়িত, যৌবনের রজগুণ তাহাকে আর চাপাদিতে

পারিত না, বরং রজগুণ সংমিশ্রণে, সত্বগুণ আরও দীপ্তি পাইত! বাল্যের সারল্য ও প্রফুল্লতাভাব যৌবনে আরও বৃদ্ধি পাইত; এইরূপে বৃদ্ধকালে তমগুণের পরিবর্ত্তে ত্রিগুণমিশ্রিত অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ আনন্দপ্রদ পবিত্র ভাবরাশির সমাবেশ হইয়া, জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিত! হায় ভারতের ভাগ্যে সেই সুদিন আবার কবে আসিবে?

দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন উৎপন্ন করতঃ উহা জলে ফেলিয়া দিলে, যেমন উহা ভাসিয়াই থাকুক আর ডুবিয়াই যাউক, কিছুতেই আপন অস্তিত্ব হারায় না, কিন্তু যদি মন্থনের পূর্ব্বে ঐ দুধ জলে ফেলা যায়, তবে উহা জল হইতে আর পৃথক্ করা যায় না, উহার আপন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে, একেবারে আপন হারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুরাকালে ঐ প্রকারে ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই প্রত্যেকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত; এজন্য তাহারা নির্লিপ্ত ও অনাসক্তভাবে গৃহস্থ-আশ্রমের পবিত্র ও গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিত। অধুনা ব্রহ্মচর্যাদি প্রাথমিক সাধনার অভাব হেতু, যুবকগণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতঃ উপরোক্ত দুগ্ধের মত সংসারের সহিত মিশিয়া আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে!—ত্রিতাপের দাবদাহী তাপে তাপিত হইয়া বিশুষ্ক কণ্ঠে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হা হুতাশ ও পরিতাপ করিতেছে! কিছুতেই শান্তি বা আনন্দ পাইতেছে না!

ভারতের ভাবী ভরসা স্থল, কোমলমতি পবিত্রহৃদয় বালকগণ, তোমরা ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হও। আবার সেই চির স্মরণীয় পবিত্র ঋষিযুগের আবির্ভাব হউক!—আবার সেই প্রাচীন শৌর্য্য বীর্য্য ফিরিয়া আসুক! সেই স্মৃতি, মেধা, সেই স্বাস্থ্য, আয়ু, সেই সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণ রাশিতে বিভূষিত হইয়া, তোমরা সানন্দে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর

হও! ঘরে ঘরে আবার তোমরা ঋষি বালকের মত শোভা পাও! স্বভাব প্রদত্ত বাল্যকালের পবিত্র গুণরাশি সাধনার দ্বারা আয়ত্ব করতঃ আদর্শ গৃহী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ কর! ভগবান ও ঋষিবৃন্দের আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক!!

অপরিগ্রহ

দেহ রক্ষার্থে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত ভোগ্য বস্তু গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ। ঠিক যে টুকু দরকার তাহাই মাত্র রাখিয়া তদতিরিক্ত সর্ব্ববিধ ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করাকে অপরিগ্রহ সাধন বলা হইয়া থাকে। আমরা বহু অভাব নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছি, বস্তুতঃ আমরা যত অভাব অনুভব করি, ভগবান আমাদিগকে তত অভাব প্রদান করেন নাই। একটী দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে অবস্থাটা কতক হৃদয়ঙ্গম হইবে! যাহার দুই কি চার খানা কাপড় হইলে অনায়াসে চলিতে পারে, তাহার দশ পোনর খানা না হইলে চলে না কেন? যে স্থলে দুইটী জামা হইলে বেশ চলে, সে স্থলে দশ সেট জামা দেখিতে পাই কেন? এক জোড়া জুতায় যেখানে সুন্দর চলিতে পারে সেখানে পাচ ছয় জোড়া ব্যবহৃত হয় কেন? তাই বলিতেছিলাম আমরা আহারে বিহারে, চাল চলনে, সর্ব্বাবস্থায় পাশ্চাত্য জড় সভ্যতার অনুকরণ করতঃ নিজেদের অভাব অভিযোগ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া, ইহার বিষময় ফল মর্ম্মে মর্ম্মে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি! সুতরাং ভোগ বিলাসের উদ্দাম লালসা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

"শৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ

অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাচটী সাধনার নাম "**নিয়ম**"—নিয়ম অর্থ ধর্ম্মাচরণ।

শরীর ও মনের মালিন্য দূর করিয়া শুদ্ধ অবস্থায় রাখার নাম শৌচ; অর্থাৎ পবিত্রতাই শৌচ। শরীরস্থ নবদ্বার দ্বারা ক্লেদ, দুর্গন্ধযুক্ত রস ইত্যাদি নির্গত হইয়া থাকে, এজন্য স্নান, গাত্র মার্জ্জনা ইত্যাদি বাহ্য আচরণ দ্বারা শরীর পরিষ্কার করতঃ শুদ্ধ রাখা প্রয়োজন। আর চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মনের মলিনতা দূর করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভগবানের নামজপ, ধ্যান, ধারণা, সৎ-চিন্তা ইত্যাদি দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়। আবার ধৈর্য্য, ক্ষমা, পরোপকার ইত্যাদি সত্ত্ব গুণের বিকাশ হইলেও চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে।

শৌচ

দেহকে ভগবানের মন্দির রূপে কল্পনা করা শৌচ সাধনের অন্যতম উপায়; যেমন দেব-মন্দির প্রতিদিন মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়, চন্দন ও ধূপাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া প্রতিদিন ভোগ দিতে ও দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই রূপ আমাদের দেহ-মন্দিরেও ভগবান আত্মা রূপে বিরাজিত থাকিয়া, সর্ব্ববিধ সেবা গ্রহণ করিতেছেন। ভগবানের এই দেহ-মন্দির প্রতিদিন ধৌত ও মার্জ্জিত করা আবশ্যক, নাম জপ ও ধ্যান ধারণাদি দ্বারা এই দেহ-মন্দির স্থিত আত্মারাম ভগবানের নিত্যপূজা করিতে হয়, সৎচিন্তা ও সৎআলোচনারূপী সুগন্ধ দ্বারা দেহ-মন্দির সুবাসিত করিতে হয়, ভোগ্য বস্তু দ্বারা মন্দির স্থিত দেবতাকে ভোগ দিতে হয়, তাহা হইলেই আত্মারামের পূজা পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। শৌচ সম্বন্ধে এই ভাবটী গ্রহণ করিতে পারিলে অতি সহজে চিত্ত শুদ্ধি হইবে। ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন "আমি ভোজন করি, মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মাকে।"

দেহ মন্দির

আপনার যে কোন অবস্থাতে অসুখী না হওয়া বা অশান্তি ভোগ

না করার নাম সন্তোষ। এ জগতে সম্রাট হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত কাহারও সন্তোষ নাই! সকলেই অসন্তুষ্ট! আশা আকাঙ্খার জ্বালাময়ী লেলিহান্ জিহ্বা সকলকেই তীব্র জ্বালায় পোড়াইতেছে!—কাহারও শান্তি নাই বিশ্রাম নাই বা সন্তোষ নাই। মানুষ পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহা এড়াইতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই; সুতরাং আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া হা হুতাশ করিলে, কি ফল হইবে? এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সন্তোষ লাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বাহিরে ভগবানের আঘাত অন্তরে আশীষ বর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে! একদিন ইহা বেশ বুঝা যাইবে যে ভগবান দয়াময়, মঙ্গলময়!—তাঁহার আঘাত নির্দ্দয়তা বা বঞ্চনা নহে!—করুণা!! ক্ষতি নহে—প্রাপ্তি!! সন্তোষের অন্য নাম শান্তি! যদি কাহারও শান্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সন্তোষকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে, নচেৎ দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় কেবল অশান্তির আগুনেই পুড়িয়া মরিতে হইবে।

সন্তোষ

সন্তোষ সাধু মহাত্মাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিকশিত অবস্থায় বিরাজমান, এজন্য তাঁহারা যেন এক একটী শান্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! রাজা মহারাজার মধ্যেও বুঝি এই প্রকার সন্তোষ বা প্রশান্তি দৃষ্ট হয় না! এই জন্য সাধু মহাত্মাগণ কৌপীন মাত্রৈক সম্বল হইলেও "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধিত হইয়া থাকেন।

তপ।

বেদবিধান অনুসারে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতোপবাস দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে তপস্যা বলে। কাহারও মতে চিত্তের একাগ্রতা এবং ইন্দ্রিয় নিরোধের নাম তপ। আবার কেহ কেহ ত্রিতাপ ও দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাদিকে উত্তম তপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ

বা দুঃখ দ্বারা জীবগণ সতত তাপিত। দুঃখ যেমন জীবগণকে অধিকাংশ স্থলেই অভিভূত করিয়া ফেলে, সেইরূপ সুখেতেও জীবগণ আত্মবিস্মৃত ও মোহমুগ্ধ হয়! সুতরাং এই উভয় রূপ দ্বন্দ্বই দুঃখের কারণ। এই দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা বা ত্রিতাপ জ্বালা সহ্য করিবার ক্ষমতাই "তপঃ" বা তপস্যা।

ত্রিতাপ।

ত্রিতাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, এখানে একটী উদ্ধৃত করা হইল। (১) আধ্যাত্মিক—সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত তাপ, অর্থাৎ মানসিক ক্লেশ। ইহার উৎপত্তির কারণ দুই প্রকার (ক) মন হইতে জাত; যথা—কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি নিবন্ধন (খ) শরীর হইতে জাত, যথা—বাত পিত্ত কফের বৈষম্য হেতু জাত পীড়া নিবন্ধন।

(২) আধিভৌতিক—পঞ্চভৌতিক দেহ মাত্র হইতে জাত তাপ; যথা—মনুষ্য, সর্প, ব্যাঘ্র, ভূত প্রেতাদি ভৌতিক দেহধারী হইতে প্রাপ্ত তাপ।

(৩) আধিদৈবিক—শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু বিপর্য্যয় ও দৈব ঘটনা হইতে জাত তাপ; যথা—অগ্নি, বাত্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত তাপ।

এই ত্রিতাপ জগতে সতত ক্রিয়াশীল, জীবগণ অহরহ এই জ্বালাময়ীর ভীষণ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে! এই দুঃসহ তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা লাভ না করিলে, জীবের জীবনভার দুর্ব্বহ হইতে থাকিবে, সংসারটা জীবের পক্ষে মরুভূমির তুল্য হইয়া উঠিবে! সুতরাং ত্রিতাপ সহ্য করা শ্রেষ্ঠ তপস্যা। অতএব সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, সম্পদে বিপদে, লাভালাভে, জয় পরাজয়ে, শীত গ্রীষ্মে, সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় দ্বন্দ্ব সহ্য করার অভ্যাস লাভ করতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিতে শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই দুঃখের অবসান হইবে। নিয়তি দুঃখের বেশে উপস্থিত হইলেও যাহার চিত্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা বিদ্রোহ প্রকাশ পায় না, যিনি

উহাকে কর্ম্ম ফলের দণ্ড বা ভগবানের দান বলিয়া সানন্দে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই দুঃখকে জয় করিয়া শান্তি লাভে সমর্থ হয়েন !!

স্বাধ্যায়।

মন্ত্রাদি অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক জপও শাস্ত্রাদি ভক্তি পূর্ব্বক অধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায়। অর্থাৎ নামজপ, স্তোত্রপাঠ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, সৎ আলোচনা, সৎ সঙ্গ ইত্যাদি স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। যে শাস্ত্র অধ্যয়নে বা আলোচনায়, অথবা যে চিন্তার ফলে, ভগবদ্ভাবের উদ্দীপণ হয় তাহাই আচরণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, এই সাধনার নামই স্বাধ্যায়।

ঈশ্বর প্রণিধান।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করতঃ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার উপাসনা করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। ভগবানে আত্ম সমর্পণ করা কঠিন হইলেও ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও বড়ই নিরাপদ সাধনা। জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন "মানবের দুর্ব্বলতাতে ভগবানের বল বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার কৃপা উপলব্ধি হয়। সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহার হওয়া যায় না, আর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইয়াছে কিনা তাহা দুঃখ না আসিলে বুঝা যায় না! দুঃখই জীবের পরীক্ষা!—সমস্ত চিন্তার ভার ভগবানে অর্পণ করতঃ তাঁহার হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া অচঞ্চল শান্তিতে চিত্ত সমাহিত করাই আনন্দ!!" সর্ব্ব কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করতঃ শুধু কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে, গুণক্ষয়ে মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত! তাই গীতাতে ভগবান, অর্জ্জুনকে নানাভাবে নানাকথায় এই শরণাপন্ন হওয়ায় শ্রেষ্ঠ পথে আসিতে আকৃষ্ট করিয়াছেন! যথা—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেণ ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

অর্থাৎ হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও তাঁহারই প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্যলোক প্রাপ্ত হইবে।

উপরোক্ত যম নিয়মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে রিপুগুলি আপনিই বশীভূত হইবে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কাম, অহিংসা দ্বারা ক্রোধ ও মাৎসর্য্য, অস্তেয় দ্বারা লোভ, সত্য ও তপ দ্বারা মোহ, সন্তোষ ও অপরিগ্রহ দ্বারা মদ জয় হয়। এতৎ ব্যতিত প্রত্যেক রিপুর বিরুদ্ধ বৃত্তির অনুশীলন করিলে তাহাদিগকে জয় করা যায়। কামের বিরুদ্ধ বৃত্তি ভক্তি; যতই ভক্তি পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে, যতই ভগবন্নামে ও প্রেমে মাতোয়ারা হইবে, কাম ততই হীনবল হইবে। ক্রোধের বিপরীত বৃত্তি ক্ষমা ও দয়া; জীবে দয়া বিমুখ ব্যক্তি কিরূপে ভগবানের দয়া আকর্ষণ করিবে? কিরূপে ভগবৎ কৃপা লাভে সমর্থ হইবে? এই প্রকার বিচার পূর্ব্বক দয়া ও ক্ষমা বৃত্তির অনুশীলন করিলে ক্রোধকে জয় করা যাইবে। অন্যান্য রিপু-গুলিকে পরিণামফল ও নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা জয় করিতে হয়।

পুরুষকার ও দৈব।

মনুষ্যত্ব সাধনের একটী প্রধান উপায় পুরুষকার। অধ্যবসায় সহ চেষ্টার নামই পুরুষকার। অধ্যবসায় ও চেষ্টা ব্যতীত কি সাধক-জীবন কি কর্ম্ম-জীবন কোন জীবনেই উন্নতি লাভ করা যায় না। পুরুষকারের সহিত দৈবের একটী অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। কেহ দৈবের প্রাবল্য হেতু দৈবকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া পুরুষকারকে একেবারে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন! আবার কেহবা পুরুষকারকেই একমাত্র বরণীয়রূপে গ্রহণ করতঃ দৈবকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত! এই উভয় বিধ লোকই

পুরুষকার ও দৈবের প্রকৃত মর্ম্ম উদঘাটনে অসমর্থ হইয়া ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিয়াছেন! পণ্ডিতদিগের মধ্যেও এবিষয়ে নানাপ্রকার বাদবিসম্বাদ, ও নানাপ্রকার কল্পনা জল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা প্রকৃত রহস্য ভেদ না হইয়া বিষয়টী আরও জটিল হইয়া পরে। সাধন-পণ্ডিতগণ পুরুষকার ও দৈব সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এস্থলে আলোচ্য।

পুরুষকার বা দৈব কোনটীরই প্রভাব কম নহে, দুইটীই প্রবল। দৈব কি?—পূর্ব্ব জন্মকৃত পুরুষকারের পরিণাম ফলের নাম দৈব! পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ পুরুষকার করা হইয়াছে, সেই কৃত কার্য্যের ফলই ইহ জন্মে দৈব রূপে প্রকটিত হইয়া কর্ম্মফল প্রদান করিতেছে! এইরূপে ইহ জন্মের পুরুষকারই ভাবী জন্মে দৈবরূপে কর্ম্মফল প্রদান করিবে! সুতরাং পুরুষকার বা দৈব কোনটীই বৃথা নহে; ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এজন্য শুধু দৈবের দোহাই দিয়া পুরুষকারে অমনোযোগী হওয়া নিতান্তই গর্হিত! কেননা ইহ জন্মে কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ যাহাই ভোগ হউক না কেন, পরজন্ম সম্বন্ধে আমিই যে আমার ভাগ্য-নিয়ন্তা! ভাবী জন্মের সুখ দুঃখের ভার যে আমারই হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে! সুতরাং পুরুষকার যে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

সামান্য পুরুষকার বা কর্ম্মের চেষ্টাও বৃথা নহে উহাও একদিন ফল প্রসব করিবে; দৈব প্রতিকুল থাকিলে, কর্ম্মের ফললাভ শীঘ্র নাও হইতে পারে, তথাপি সেই কর্ম্ম বৃথা হইবে না; কর্ম্মফল সগর্ভ অবস্থায় সূক্ষ্মভাবে ঐ কর্ম্মে অবস্থান করিবে, যখনই দৈবের প্রতিকুলতা অপসৃত হইয়া অনুকুল ভাবের উদয় হইবে, তখনই ঐ কর্ম্ম প্রসবিত হইয়া যথাযোগ্য ফল প্রদান করিবে! দৈব বা কর্ম্ম ফলের ভীষণ প্রতিকুলতা থাকিলে,

বর্ত্তমান কর্ম্মের ফললাভ ইহজন্মে না হইয়া পর জন্মেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে কর্ম্মের চেষ্টা বিফল নহে, যত দিনেই হউক উহা একদিন সফলতা লাভ করিবেই করিবে!

অনেক সময়ে দেখা যায় কেহ কেহ বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে বেশ অধ্যবসায়ী, কিন্তু ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন! তাহারা বলিয়া থাকে যে, কপালে থাকিলে কিম্বা ভগবানের ইচ্ছা হইলে আপনিই ধর্ম্ম লাভ হইবে চেষ্টা করিলে আর কি হইবে? এই শ্রেণীর লোক বিষয় কর্ম্মের বেলা পূর্ণভাবে পুরুষকার, আর ধর্ম্মের বেলা সম্পূর্ণ দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ কপটাচরণ পূর্ব্বক আত্ম-প্রতারণাই করিয়া থাকে। অবশ্য দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাও একটী উচ্চতর সাধনা; কোন কোন সাধু মহাত্মা এই ভাব অবলম্বন করতঃ "আকাশ বৃত্তি" গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা এক স্থানেই বসিয়া থাকেন, কোন প্রকার আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন না, ভগবৎ প্রেরণায় যাহা কিছু অযাচিত ভাবে উপস্থিত হয় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন! এক কথায় তাহারা সর্ব্বচিন্তা ও চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের ইচ্ছার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন। এবম্বিধ নির্ভরের ভাব সাধারণ মনুষ্যে আসিতে পারেনা! অতএব সাধারণ লোকের পক্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দৈবের উপর নির্ভরতার ভাব প্রকাশ করা, কপটতা ও আত্ম-প্রতারণার নামান্তর মাত্র! বিশেষতঃ আমরা যখন বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে নির্ভরশীল না হইয়া সততই সর্ব্ববিষয়ে পুরুষকার করিতেছি তখন ধর্ম্মের বেলা দৈবের দোহাই দেওয়া কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে! সুতরাং ধর্ম্মাচরণে বিশেষভাবে পুরুষকার করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মার্থে পুরুষকার করিতে সাধারণতঃ মানুষ কি প্রকার উদাসীন তাহা মহাভারত হইতে একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এক সময়ে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একটী বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন,এমন সময় ভগবৎ মায়ায় একটী অভিনব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন একটী বৃক্ষের ডালে একটী মধুচক্র রহিয়াছে, ঐ চক্র হইতে অনেকক্ষণ পরে এক একটী মধুর ফোটা নির্গত হইতেছে। উহার তলদেশে একটী যুবক মধুপানের জন্য উন্মত্ত হইয়া চক্রের নিম্নে সোজাসুজিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিবদ্ধকরতঃ মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে,আর যখনই মধুর এক একটী ফোটা মুখে পড়িতেছে, অমনি উহা পানকরতঃ পুনরায় আর একটী ফোটা পাওয়ার প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হইতেছে! যুবকের পশ্চাদ্দেশে একটী ভীষণ কালসর্প ফণা বিস্তার-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া যুবকের মস্তকোপরি লেলিহান জিহ্বা বিস্তারকরতঃ তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত। যুধিষ্ঠির দূর হইতে এই বিস্ময়জনক ভীষণ অবস্থা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও যুবককে পলায়ন করিতে বলিলেন, কিন্তু যুবক নিরুত্তর ও পূর্ব্ববৎ অচলভাবেই রহিল। তখন যুধিষ্ঠির ঐ যুবকটীকে রক্ষা করার জন্য তাহার দিকে সবেগে ধাবমান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে মধুলুব্ধ ভ্রান্ত যুবক! পালাও পালাও।----কালসর্প তোমাকে দংশন করিতেছে! অতি সত্বর দূরে প্রস্থান কর;" যুবক পূর্ব্ববৎ মধুচক্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই যুধিষ্ঠিরের দিকে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়া উঠিল "আর এক ফোটা"! তন্মুহূর্ত্তে কালসর্প দংশনে যুবক ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল! এত চেষ্টা করিয়াও যুধিষ্ঠির এই যুবকটীকে রক্ষা করিতে না পারায়, তিনি সেখানে বিষণ্ণবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া, ভগবান তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "হে যুধিষ্ঠির তুমি ক্ষুণ্ণ হইতেছ কেন? যাহা দেখিলে ইহাই সংসার চিত্র! সংসারে সর্ব্বদাই এই প্রকার অভিনয় হইতেছে! ঐ মধুচক্রই সংসার, আর ঐ মধু ফোটাই বাসনা কামনাদি

সংসার চিত্র।

বৃত্তি, আর ঐ সর্প টাই মৃত্যুরূপী মহাকাল! মায়ামুগ্ধ জীব সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া উন্মত্ত বাসনা কামনার চিরঅতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যু সন্নিহিত হইলেও দুরাশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না—একবারও মৃত্যুচিন্তা করিতেছে না! এইরূপে জীবগণ দুরাকাঙ্ক্ষার তীব্র হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া, অতৃপ্ত বাসনায় জ্বালাময়ী উত্তাপে বিদগ্ধ হইয়া, মৃত্যুর করাল কবলে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে!"

এই মধুচক্রের ভাবটী সাংসারিক জীবনে পরিস্ফুটরূপে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ে পুরুষকারের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন, ত ব তাহাদের মতে ঐ প্রকার চেষ্টা করার ইচ্ছা থাকিলেও কেবল সময় অভাবেই তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না! একটী উদাহরণ দিলে বিষয়টী স্পষ্ট বুঝা যাইবে। জনৈক ব্যক্তি যেন ইচ্ছা করিতেছেন যে, তাহার পুত্রটীকে একটু মানুষ করিতে পারিলেই সংসারের ভারটা তাহার উপর কতকটা দিয়া ধর্ম্মসাধনা করিবেন, তৎপর যেন তাহার পুত্র বেশ উপযুক্ত হইয়া বিষয় কর্ম্ম করিতে লাগিল, তখন মনে হইতে লাগিল এই নাতনীটীর বিবাহ না দিলেই চলে না এর পরই ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিব। নাতনীটীর বিবাহও হইল, ইতিমধ্যে একটী পৌত্রের জন্ম হইল। এক্ষণে পৌত্রটীর অন্নপ্রাশন না দিলেই চলে না! যাহা হউক এই ব্যাপারের পরে নিশ্চয়ই ধর্ম্মে মন দিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিলেন। তখন যেন একটী বৈষয়িক গোলমাল উপস্থিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গের সহিত মোকদ্দমা রুজু হইল! আর সময় কোথায়?—বড়ই বিভ্রাট! এই প্রকারে মোকদ্দমা ব্যাপারের অবসান হইতে না হইতেই আরও দুএকটী নাতি নাতনীর বিবাহাদিরও সময় উপস্থিত হইল! এইরূপে জীবনব্যাপি সাংসারিক নানাবিধ গোলমাল চলিল, ধর্ম্মকর্ম্মের সময় আর হইল না!—ইতিমধ্যে শমন রাজার নিকট হইতে তলপ আসিয়া পরায়, ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া সংসারের নিকট হইতে

চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল!—সংসারের মোহ-মদিরা আর এক ফোটা পান করিতে না করিতেই, মহাকাল সর্প দংশন করিয়া ফেলিল!!

সংসারের গোলমাল কিছুতেই মিটিবে না; প্রত্যেকের জীবনেই একটা না একটা কর্ত্তব্য সম্পাদনের গুরুতর দায়িত্ব থাকিবেই থাকিবে!—একেবারে নিশ্চিন্ত শান্তি পরিপূর্ণ অবস্থা সংসারে বিরল, সুতরাং এই সাংসারিক গোলমাল এবং কোলাহলের মধ্যেই ধর্ম্ম সাধনের জন্য একটা সময়, শত বাধা-বিঘ্ন উল্লঙ্ঘনকরতঃ বলপূর্ব্বক করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ এই সাধনযোগ্য দুর্লভ মানবদেহ লাভ করিয়াও বলীবর্দ্ধের ন্যায় শুধু সংসারের বোঝা টানাই সার হইবে!—সর্ব্ব রসের আধার, অপূর্ব্ব তত্ত্বময় অমূল্য মানবজীবন পাইয়াও পশুপক্ষীর ন্যায় অজ্ঞানতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া, জন্মমৃত্যুর অশেষ ক্লেশদায়ক পথেই পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিতে হইবে!!

এক্ষণে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত নিত্য শুদ্ধ নিরঞ্জন শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের শ্রীচরণসরোজে প্রণিপাতকরতঃ এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলাম।

নিত্যং শুদ্ধং নিরঞ্জনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্॥

ওঁ হরি ওঁ

হরি ওঁ তৎ সৎ

সনাতন-ধৰ্ম্মে মানব-জীবন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবত্ব।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই দেবত্ব। যখন মানুষ আপনাকে শুধু স্বার্থের ক্ষুদ্রগণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিতে চায় না, আপনাকে অসীমে বিলাইয়া দিতে প্রয়াস পায় তখন সে দেবতা! পরার্থে আত্মনিয়োগ দেবত্বের লক্ষণ। যখন মানুষ আপন প্রতিবাসী বা দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ ও যথাসাধ্য স্বার্থত্যাগ করতঃ তাহার দুঃখ দূর করিতে চায়, তখন সে দেবতুল্য। পরোপকার করাই যাহার জীবনের প্রধান ব্রত ও অবলম্বন, তিনি নররূপী দেবতা! ধনকুবেরগণ কুপমণ্ডূকের ন্যায়, চাটুকার পরিবেষ্টিত হইয়া ভোগ বিলাসে মত্ত থাকাই শ্রেয় মনে না করিয়া যখন দেশ ও তীর্থ পর্য্যটনাদিতে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করিতেছেন, আপনার অর্থ পরোপকার ও দেশ-হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া, অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে তাঁহাদের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে! বিপন্ন নরনারী-গণের সেবা এবং জন্মভূমির সেবা ভগবানের সেবা ব্যতিত আর কিছুই নহে। যাহারা স্বদেশের অকৃত্রিম সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, দেশের ও দশের উন্নতি সাধনই যাহাদের জীবনের পবিত্র ব্রত, সেই মহাত্মাগণ নরাকার হইলেও দেবতা!—তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় সম্মান প্রদান করিলে উহা যোগ্য পাত্রেই অর্পণ করা হইবে!

সংযম, পরার্থপরতা এবং ভগবৎপরায়ণতা, এই তিনটী দেবত্বের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ; প্রথমটীর সাফল্যে, হৃদয়ে শান্তিলাভ; দ্বিতীয়টীর সাফল্যে, জীবে প্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টীর সফলতায় ভগবানে ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। কলি-কলুষ-নাশন পতিত-পাবন পরম দয়াল প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব, চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে সমগ্র ভারতব্যাপী যে অমূল্য মহাবীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন, যাহার অবশ্যম্ভাবী সফলতা তিনি মহোল্লাসে বিজয় নিনাদে জগতে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন, সেই **"জীবে দয়া নামে রুচি"** * রূপী মহাবীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া আজ সমগ্র ভারতব্যাপী কল্পতরুরূপে শোভা পাইতেছে! সেই মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবার জন্য আজ ভারতের নরনারী ব্যস্ত! তাই দেখিতে পাই, নররূপী নারায়ণ সেবার মহাব্রত আজ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে উদযাপিত! দলে দলে যুবকগণ এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে; দুঃখার দুঃখ মোচনে, বন্যার্ত্তের কাতর প্রার্থনায়, আজ যুবকগণের হৃদয় করুণারসে বিগলিত। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নামের বন্যাতে জগতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভাসিয়াছে; হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান, বৌদ্ধ জৈন, সকলেই নাম গানে মত্ত! সাম্প্রদায়িক ভেদভাব নাম-তরঙ্গে চিরতরে ডুবিয়া গিয়াছে! ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞানী, পুরুষ নারী, সকলেই নামের সুশীতল প্রস্রবনে স্নাত হইয়া ত্রিতাপের দাবদাহী তাপ দূর করিতে প্রয়াস পাইতেছে!

পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে জগতে নরাকার পশুর অভাব নাই অন্তরে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নররূপী দেবতাও বিরল নহে! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সংযমিত, অর্থ পরোপকারে নিয়োজিত, যাহার হৃদয় পর-দুঃখ মোচনের জন্য করুণারসে সিক্ত, মন ভগবানের নাম রস পানে

* ইহাই পরার্থপরতা বা জীবে প্রীতি এবং ভগবৎপরায়ণতা।

বিগলিত, এবম্বিধ মহাত্মার অভাব নাই, ইহারা গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী, আর সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী! ইহারা নররূপী দেবতা! একটা প্রবাদ আছে, "দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয়" ইহা অতি সত্য কথা, দশজন যাহাকে মান্য করে, দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাহাতে যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমার পরিচিত দুইটী যুবক বিগত ১৩২০ সালের বন্যার্ত্ত-সেবার কার্য্য সুসম্পন্ন করতঃ ফিরিবার পথে, কলিকাতার বাগবাজার স্থিতা জগদম্বার অংশীভূতা শ্রীশ্রীমার* শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিল, মা তাহাদের সহিত আলাপে বুঝিলেন যে তাহারা সেবাকার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতেছে, তখনই জনৈক ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ সরলভাষায় বলিতে লাগিলেন "ওরে শুনেছিস্ এরা বন্যায় সেবা করতে গিয়াছিল, আহা এরা দেবছেলে!—এরা দেব ছেলে!

নররূপী নারায়ণ সেবা দেবত্ব প্রভৃতি চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অন্যতম উপায়, তাই দূরদর্শী মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনও এই পবিত্র সেবাব্রত গ্রহণ করতঃ ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন।

দেবত্বলাভের উপায়।

এক্ষণে দেবত্ব লাভের উপায় কি? কিরূপে মানুষ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেবত্বে উপনীত হইতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। স্বার্থই জীবের জীবন ও অবলম্বন, অথচ স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে দেব-

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্ম্মিনী।

লাভ সুদূরপরাহত! এই স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিতে হইলে, কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন, কতকগুলি বিশেষভাব অবলম্বন ব্যতিত স্বার্থত্যাগ বা দেবত্ব লাভ হইতে পারে না। আর্য্যঋষিগণ এ সম্বন্ধে বহুপ্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটী এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

দেবত্ব লাভের প্রধান উপায় আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ ভক্তি লাভ। ভক্তির সহিত আসক্তির অতি নিকট সম্বন্ধ। ভক্তি কি? শাণ্ডিল্য

আসক্তি ও ভক্তি।

ঋষি বলিয়াছেন "**সা পরানুরক্তিরীশ্বরে**" অর্থাৎ পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তি বা প্রাণের ঐকান্তিক টানকেই ভক্তি বলে। প্রাণের ঐকান্তিক টান ভগবান সকল জীবকেই দিয়াছেন। জীবমাত্রই প্রাণের এই 'টান' দ্বারা যখন বিষয়ভোগ করে, তখন সেই টানকে "আসক্তি" বলা হয়। কৃপণ ব্যক্তির ধনের উপর যে টান, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে টান, অথবা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে প্রাণের টান কিম্বা বিষয়ী ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তির উপর যে প্রাণের টান এই সকল টানের নাম আসক্তি! আবার প্রাণের এই টানগুলি যখন বিষয় বাসনা হইতে ফিরিয়া ভগবানের দিকে আকৃষ্ট ও পরিচালিত হয়, তখনই ইহাকে "ভক্তি" বলা হইয়া থাকে। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—

"যা চিন্তা ভুবি স্ত্রী-পুত্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপার সম্ভাষণে
যা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ-যশসাংলাভে সদা জায়তে।
সা চিন্তা যদি নন্দনন্দন-পদদ্বন্দারবিন্দে ক্ষণং
কাচিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বার প্রয়াণে প্রভো॥"

অর্থাৎ হে প্রভো, এসংসারে স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদির সন্তোষ ও ভরণ পোষণের নিমিত্ত যেরূপ ঐকান্তিক চিন্তা করা হয়, যশলাভের জন্য এবং ধন ঐশ্বর্য্যাদি বিষয় ভোগের জন্য যেরূপ চিন্তা করা হয়, সেইরূপ ঐকান্তিক চিন্তা যদি

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যুগলচরণ কমলে ক্ষণকালের জন্যও অর্পিত হয়, তাহা হইলে ভীষণ যমরাজের দ্বারে যাইতে অর্থাৎ মৃত্যুতে আর চিন্তা কি?

আর্য্যঋষিগণ ভক্তিকে শান্তিরূপা, পরমানন্দরূপা, পরমপ্রেমরূপা ও অমৃত স্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দ রূপাচ্চ।"
"ওঁ সা কস্মৈ প্রেমরূপা"
"ওঁ অমৃত স্বরূপাচ্চ॥"

নারদ সূত্র।

ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা হইলেও, যখন গুণময়ী প্রকৃতির বিভিন্ন আধারে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়, তখন সগুণা। যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার ভক্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে; এজন্য গুণময়ী ভক্তি সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা তামসী, রাজসী ও সাত্বিকী। তামস স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্য, ভগবানকে যে ভক্তি করিয়া থাকে, উহা তামসী ভক্তি—যথা, দস্যু তস্করাদি কৃত কালীপূজা, পাণ্ডবদিগকে বধের অভিপ্রায়ে জয়দ্রথের কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবের সন্তোষ বিধান ইত্যাদি। রজগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ, বিষয় ভোগ বা যশ ঐশ্বর্য্যাদি লাভের জন্য ভগবানকে যে অর্চ্চনা বা ভক্তি করিয়া থাকে উহা রাজসী ভক্তি। যে সকল সত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি পার্থিব কোনরূপ ভোগবিলাস আকাঙ্ক্ষা করেন না, অথচ অপার্থিব ভোগ কামনা করতঃ স্বর্গাদি লাভের অভিলাষী হইয়া ভগবানকে ভজনা করেন, অথবা আপনাদের কামনা পূরণার্থ ভগবানের স্বকীয় ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা না করিয়া, কাম্যভাবে পাইতে অভিলাষী হন ও ভক্তি করিয়া থাকেন এই প্রকার ভক্তিকে সাত্বিকী ভক্তি বলা হইয়া থাকে। সকাম ভক্তি দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভে কামনা পূরণ হইলেও, উহাদ্বার

ভগবানকে স্বরূপে লাভ করা যায় না; উহাকে গৌণা বা অপরা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। আর ভক্তি অহেতুকী হইলেই উহা শুদ্ধা বা নির্গুণা; ইহাকে মুখ্যা বা পরাভক্তি বলা হয়।

এস্থলে একটী পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিবৃত করিব, ইহাদ্বারা ভক্তির সকাম ও নিষ্কাম ভাবের পার্থক্য কতকটা বুঝা যাইবে। দ্বারাবতী নগরে ভগবান ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়া, একই সময়ে বহু বপু ধারণ ও সকলের গৃহে অবস্থান করতঃ যথাযোগ্য ভাবে সকলের সন্তোষ বিধান করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রবণে দেবর্ষি নারদ বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এই লীলা সন্দর্শনের জন্য মর্ত্তে আগমন করতঃ নানাবিধ লীলা দর্শন করিলেন। নারদ দেখিলেন যে, কোথাও কোন নারী ভগবানের সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় রত, কোথাও জলকেলী, কোথাও হাস্য পরিহাস, কোথাও বা অর্থাগমের আলোচনা, কোথাও ভোগবিলাসের আয়োজন, আবার কোথাওবা কলহ ইত্যাদি নানা প্রকার অভিনব ভাবে, নারীগণ ভগবানের সহিত নিমগ্ন! দেবর্ষি নারদ ভগবানের যোগমায়া প্রভাবযুক্তা ঈদৃশী অপূর্ব্ব মহিমা সন্দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান কেন বহুরূপীর ন্যায় অদ্ভুত ভাব অবলম্বন করতঃ এবম্বিধ নানা-প্রকার লীলা খেলা করিতেছেন? যাহা হউক পরিশেষে তিনি রুক্মিনীর গৃহের নিকট আসিয়া দেখিলেন, ভগবান শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর রুক্মিনী তাঁহার নিকটে বসিয়া পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। ভগবান বলিলেন 'রুক্মিনী, তুমি যে আমাকে এরূপ প্রাণপণে সেবা করিতেছ, তুমি আমার নিকট কি চাও?" রুক্মিনী বলিলেন, "প্রভো দয়া করিয়া তুমি চরণ সেবার অধিকার দিয়াছ, ইহাতেই আমি কৃত কৃতার্থ! আর কি চাইব নাথ?— আমি কিছুই চাইনা!" তখন ভগবান উত্তর করিলেন, "তুমি কিছু না চাইলে

ভক্তি বিষয়ে পৌরাণিক গল্প।

কি হইবে, তোমাকে একটা কিছু না দিলে যে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমাকে একটা কিছু চাইতেই হইবে!” তখন রুক্মিনী বলিলেন “আমি তো কিছুই চাইবার দেখিনা, তবে যদি নিতান্তই কিছু দিতে হয়, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই দাও!” তখন ভগবান বলিলেন “রুক্মিনী তোমারই জয় হইল তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই! আমাকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিলেও যে তোমার যোগ্যদান হয় না! যাহা হউক তুমিই আমাকে স্বরূপে লাভ করিবে।” তৎপর ভগবান আরও বলিলেন, “দেখ, এই যে এখানকার রমণীগণ আমাকে ভজনা করিতেছে, ইহারা প্রত্যেকেই আপন আপন কামনা পূরণার্থে তাহাদের স্বকীয় ভাবে আমাকে পাইতে অভিলাষ করিতেছে; আমার ভাবে আমাকে কেহই প্রার্থনা করিতেছে না! সুতরাং আমি তাহাদের মনোমত ভাব-দেহ অবলম্বনে তাহাদের অভিলাষ পূরণ করিতেছি। ইহারা আপন আপন কামনা দ্বারা আপনারাই প্রতারিত হইতেছে! আমার স্বরূপভাব ইহারা কেহই পাইবে না! কিন্তু তুমিই একমাত্র স্বরূপজ্ঞানে আমাকে লাভ করিবে!” এই সমস্ত কথা শ্রবণে দেবর্ষি বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

এই প্রকট লীলাতে ভগবান এক হইলেও, শুধু লোক শিক্ষার জন্য যোগমায়া প্রভাবে বহু পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ নানাবিধ লীলা চাতুর্য্যে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তে রুক্মিনী ব্যতীত অন্যান্য নারীগণের ভক্তি সকাম হেতু গুণময়ী (সাত্বিকী) আর রুক্মিনীর ভাব অহেতুকী বিধায় নিগুর্ণা অতএব শুদ্ধা। এই শুদ্ধাভক্তি গাঢ় হইলে ভাব ভক্তি এবং পরিপক্ক অবস্থায় প্রেমভক্তি রূপে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এবিষয়ে সুন্দর মীমাংসা রহিয়াছে যথা—

“আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলিকাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম মহাবল॥"

সকাম প্রার্থনায় কিরূপ ঠকিতে হয় তাহা কবিবর ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন; হরি-হর-বিরিঞ্চি আরাধ্যা স্বয়ং জগদম্বা অন্নপূর্ণা বর দিতে চাহিলে, পাটনী তাহার সন্তানগণের জন্য "দুধভাত" প্রার্থনা করিয়াছিল। যথা;—

আহ্লাদে পাটনী তবে কহে যোড়হাতে
"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে!!"

ভক্তকুল-চূড়ামণি প্রহ্লাদ পিতাকে বলিয়াছিলেন, "ভগবান বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তি যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, * ভগবানকে অর্পণ করতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন মনে করি!" শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির এই প্রকার নববিধ লক্ষণই "নববিধা ভক্তি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ভক্তিলাভের উপায়

এক্ষণে ভক্তিলাভের উপায় কি? এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ভক্তি সূত্রকার বলিয়াছেন:—

"মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপা লেশাদ্বা।"

অর্থাৎ মহতের কৃপা দ্বারা কিম্বা ভগবানের কৃপালেশ দ্বারা ভক্তি লাভ হইতে পারে।

জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন, ভক্তি লাভ করিতে হইলে ত্রিবিধ কৃপার প্রয়োজন, প্রথমতঃ আত্মকৃপা, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর কৃপা, পরিশেষে গুরু কৃপা। আত্মকৃপার তাৎপর্য্য এই যে, নিজকে নিজে কৃপা করিতে হইবে, অর্থাৎ

* সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা অন্য কোন প্রকার কামনার অপেক্ষা করেনা অর্থাৎ অহেতুকী শুদ্ধ ভক্তি।

নিজের ভিতর সর্ব্বাগ্রে ভক্তি বা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া চাই আপন অন্তরে এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসা বা আকাঙ্খা উদয় না হইলে অপরের শত উপদেশেও কিছু হইবে না। ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নিকট ভগবৎ প্রসঙ্গ নিস্ফল হইয়া থাকে! সুতরাং প্রথমতঃ "আত্মকৃপা" চাই, প্রাণে ব্যাকুলতা আসা চাই! তৎপর ঈশ্বর কৃপা, ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রাণে ব্যাকুলতা আসিলে তাহা পূরণার্থে ভগবান এমন সঙ্গ জুটাইয়া দিবেন. যাহাতে প্রাণের প্রাথমিক ভাবরাশি পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ তখন সৎসঙ্গ লাভ হইবে! তৎপর যখন প্রাণে তীব্র আকাঙ্খা জাগ্রত হইবে, তখন ভগবান সদগুরু লাভ করাইয়া দিবেন, ইহাই "ঈশ্বর কৃপা"। পরিশেষে সদ্‌গুরু লাভান্তে, ভক্ত যখন তাঁহার উপদেশে ও কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হয়, ইহাই "গুরুকৃপা।" এই ত্রিবিধ কৃপা দ্বারা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

ভক্তি সূত্রকার পুনরায় বলিয়াছেন ;—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে ॥"

নারদপুরাণ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। সকল শাস্ত্রেই সৎসঙ্গের অশেষ ফল বর্ণিত আছে; যেমন সুগন্ধি পুষ্প হইতে সর্ব্বদাই সুগন্ধ নিঃসরিত হইয়া থাকে, যেমন গলিত মৃত দেহ হইতে সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ নিঃসরিত হয়, সেইরূপ যাহার যে গুণ বা ভাব প্রবল, তাহার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মভাবে সেই গুণ বা ভাব সতত বিকীরণ হইয়া থাকে। এজন্য তম প্রধান বা অসৎ লোকের সংসর্গে অসৎ ভাবরাশি সংক্রামিত হইয়া অন্তরস্থ সদ্ভাব গুলিকে চাপা দেয়; পক্ষান্তরে সৎসঙ্গে সত্বগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং পবিত্রভাবরাশি সংক্রামিত হইয়া অন্তরস্থ অসদ্ভাব গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে! এজন্য, সাধু মহাত্মার দর্শন স্পর্শনের

সৎসঙ্গ

অশেষ প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের সমীপে উপবেশন করাও নিষ্ফল হয়না; সুতরাং সৎসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

"ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্যও সৎসঙ্গ করিলে উহাই ভবসমুদ্র পারের নৌকা স্বরূপ হইয়া থাকে।

ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভক্তির বিপরীত বৃত্তিই আসক্তি; এই আসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কিরূপে ভক্তি লাভ হইবে? সুতরাং আসক্তি পরিহারের দুএকটী উপায় বিবৃত করিব। আসক্তি পরিহারের প্রধান উপায় "নিত্যানিত্য বিচার"; নিত্য কি, আর অনিত্য কি, এসম্বন্ধে বিচার করিলে ক্রমশঃ অনিত্য বস্তুতে আসক্তি রহিত হইয়া নিত্য বস্তুতে রতি জন্মিবে, ইহারই নাম "বিবেক।" এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সকলই অনিত্য, প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হইতেছে না! সদ্য প্রসূত বালকের আজ যে শারিরীক বা মানসিক অবস্থা, এক বৎসর পরে পুনরায় বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহার শরীর ও মনের বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! এইরূপে যদি পঞ্চম দশম কিম্বা বিংশতি বৎসরের সময় বিচার করা যায়, তখন শরীর ও মনের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে। এইরূপে যৌবনের পর জরা, বার্দ্ধক্য, অতি বার্দ্ধক্য পরিশেষে মৃত্যু!—এই তো দেহের পরিণাম! এই দেহের আবার এত অহংকার! সমগ্র জগতে যে অসংখ্য নরনারী দৃষ্ট হইতেছে একশত বৎসর পরে ইহাদের কেহই এ জগতে আর থাকিবে না! এত

আসক্তি ত্যাগের উপায়।

যত্নে লালিত পালিত দেহখানি হয় শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য, কিম্বা শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে!—মাটীর দেহ মাটীতে মিশিবে!

এই তো গেল দেহের কথা; তারপর, বিষয় সম্পত্তি, বাড়ীঘর লইয়া যে "আমার আমার" করিয়া অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছি, বিষয় সম্পদে মত্ত হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছি। ইহার কোনটা আমার? আমার সাধের দেহটাই যখন আমার নয়, ইহাকেও যখন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তখন অন্য বিষয়ে আর কথা কি? এই সব বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য; বিচার শূন্য জীবনকে শাস্ত্রকারগণ মৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার এই বাড়ীতে, আমার পিতা মাতা পিতামহ আদি পূর্ব্বপুরুষগণ বাস্তব্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও "আমার আমার" করিয়া ইহাকে সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন! তাঁহারাও মহামায়ার মোহমদিরা পানে মত্ত হইয়া এই বাড়ীতে, এই বাগানে, এই পুকুর ঘাটে কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছেন—আশা আকাঙ্ক্ষার কতই না উন্মত্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু হায়, কই তাঁহারা? কালের অপ্রতিহত প্রভাবে সকলেই অনন্তে বিলীন হইয়াছেন! যাহার, অক্ষয় ভাণ্ডারের জিনিষ তাঁহারই আছে, তাঁহারই থাকিবে। মাঝখানে দুদিনের জন্য শুধু "আমার আমার" করিয়া জীব মায়ামোহের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করিতেছে।

এই ভবরঙ্গমঞ্চে আমরা প্রত্যেকেই অভিনেতা সাজিয়া, এক একটি অভিনয় করিতেছি! আমরা সকলেই অভিনেতা, আর এই নাটকের প্রণেতাই একমাত্র দ্রষ্টা। এই বিশ্বনাটকের প্রথম গর্ভাঙ্ক মাতৃগর্ভে অভিনীত হয়, তৎপর এক অঙ্কের পর আর এক অঙ্কে অভিনয়, এইরূপে বহু অঙ্কে ও দৃশ্যে অভিনয় করিয়া পরিশেষে ইহার যবনিকা পতন হয়। মৃত্যুই এই নাট্যলীলার

বিশ্বনাটক।

যবনিকা! এই যবনিকার পরপারে গেলে এই বিশ্ব নাটকের অভিনয়টা একটা বৃহৎ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইবে!

প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলেও এই বিশ্ব-নাট্যলীলা স্বপ্ন ব্যতিত আর কিছুই নহে! আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন উহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না; প্রবুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সত্যবৎ দেহে ও মনে ক্রিয়া করিয়া থাকে! স্বপ্নাবস্থায় হর্ষ বা বিষাদ কিম্বা ভয়ের লক্ষণ দেহে বেশ প্রকাশ পায়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হওয়ামাত্র, উহা সকলই মিথ্যা হইয়া যায়। সেইরূপ জগতে আমরাও মায়ামোহের নিদ্রায় অভিভূত হইয়া এক একটী সুখের কিম্বা দুঃখের সুদীর্ঘ স্বপ্ন দেখিতেছি! কিন্তু কোনরূপে একবার এই মায়া-নিদ্রার বিভীষিকা হইতে জাগিতে পারিলে, এই সংসার লীলা স্বপ্নবৎ কিম্বা নাট্যবৎ প্রতীয়মান হইবে।

একজন দরিদ্রব্যক্তি যদি স্বপ্নে রাজা হইয়া রাজভোগাদি ভোগ করে, নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার সুখস্বপ্ন সব ফুরাইয়া যায়, সেইরূপ এই সংসারের রাজত্বও একটা স্বপ্নমাত্র। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহার পরিসমাপ্তি! তাই উপনিষৎকার বলিয়াছেন,—

> “স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্ব নগরং যথা।
> তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥”
>
> মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

অর্থাৎ যেমন স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব নগর দর্শন করিলেও উহা সম্পূর্ণ বৃথা, জ্ঞানীগণ এই বিশ্বলীলাকেও সেইরূপ স্বপ্নবৎ মনে করিয়া থাকেন।

তারপর, এই জগতের সুখ দুঃখের অনিত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিলে অনাসক্ত ভাব আসিবে। এই জগতে কেহ রাজা, কেহবা প্রজা, কেহ ধনী, আবার কেহবা নির্ধন! ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি, আলোচনা করা যাউক। ভোগ দ্বারা ভোগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, বরং

তাহাতে ভোগাকাঙ্খা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় শত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক আরও প্রবল হইয়া জ্বালা প্রদান করে! সুতরাং রাজভোগ দ্বারা যে রাজা খুব সুখী, একথা বলা যায় না; আবার কুটীর বাসী একাহারী ভিখারীই যে দুঃখী, একথা অনুমান করাও ঠিক নহে। মানসিক শান্তি বা অশান্তি দ্বারা সুখ দুঃখের বিচার করিতে হইবে। নীতিশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত-প্রবর চানক্য বলিয়াছেন, "সন্তোষরূপ অমৃত পানে যাহাদের চিত্ত তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাদের যে সুখ বা শান্তি, ধনলুব্ধ হইয়া যাহাদের চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, তাহাদের সে সুখ বা শান্তি কোথায়?" জনৈক

সাধুর দৃষ্টান্ত।

প্রসিদ্ধ মহাত্মা আকবর বাদশাহের সহিত দেখা করিতে যান, বাদশাহ তখন নেমাজ পড়িতে ছিলেন, নেমাজ ও প্রার্থনাদি শেষ হইলে তাঁহার সহিত বাদশাহের দেখা হইল, কিন্তু মহাত্মা তখনই বাদশাহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন; ইহাতে বাদশাহ বিস্মিত হইয়া মহাত্মাকে বলিলেন যে, "আমার দ্বারা আপনার কি সাহায্য হইতে পারে?" তাহাতে মহাত্মা উত্তর করিলেন, "আমি আপনার নিকট কিছু প্রার্থী হইয়াই আসিয়াছিলাম, আমার ধারণা ছিল, আপনি প্রকৃতই বাদশাহ! কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, আমার ভুল হইয়াছে, আপনিও একজন ভিখারী মাত্র! আপনিও রাজ্য সম্পদ ভোগ বিলাসাদি প্রার্থনা করিতেছেন! সুতরাং ভিখারীর নিকট ভিখারীর আর কি প্রার্থনা হইতে পারে? আপনি যাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আমিও তাঁহার নিকটেই আমার আকাঙ্খিত বস্তু প্রার্থনা করিব, এক্ষণে বিদায় হই" এই বলিয়া মহাত্মা চলিয়া গেলেন। মহামতি আকবর এই ঘটনায় বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং ইহা মহাত্মার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অতএব ধনবান হইলেই প্রকৃত ধনী এবং নিঃস্ব হইলেই দরিদ্র, এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি মূলক! জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;-

শ্রীমাংশ্চ কো ? যস্য সমস্ততোষঃ।
কো বা দরিদ্রোহি ? বিশাল তৃষ্ণঃ॥

মানরত্নমালা।

শ্রীমান অর্থাৎ ধনী কে ? যাহার সর্ব্ববিষয়ে সন্তোষ আসিয়াছে। আর দরিদ্র কে ? যাহার বহু আশা! অর্থাৎ যাহার আশা আকাঙ্খার নিবৃত্তি বা তৃপ্তি নাই।

অতঃপর সংসারে রাজা এবং ভিখারীর শেষ পরিণাম চিত্রটী দর্শন করিবার জন্য একবার শান্তিময় শ্মশানের দৃশ্য আলোচনা করা যাউক। এখানে পাপী তাপী, সুখী দুঃখী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কিম্বা রাজা ভিখারীতে, কোনও প্রভেদ নাই। সকলেরই এক গতি! ঐশ্বর্য্যের অহংকার, ধনমানের অহংকার, সকল অহংকারের অহংকার এখানে চূর্ণীকৃত। সকল অশান্তি, সকল জ্বালা এখানে চিরতরে উপশমিত!! জনৈক মহারাজা ও একজন ভিখারীর দেহ যেন আজ এই মহা শ্মশানে বিলীন হইয়াছে, এক্ষণে মৃত্যুর পরপারে এই দুই জনের অবস্থা চিন্তা ও বিচার করিলে কি দেখিতে পাইব? এই রাজা যদি গুরুতর দায়িত্ব পরিপূর্ণ আপন কর্ত্তব্য পালন না করিয়া স্বেচ্ছাচারী ও পাপাসক্ত হইয়া থাকেন, তবে আজ তাহার কি দুরবস্থা। আজ তাহার মত দুঃখী আর কে আছে? তাহার পাত্র মিত্র সহায় সম্পদ বন্ধুবান্ধব স্ত্রীপুত্রগণ আজ এই দুঃসময়ে কোথায়? সেই অজানা দেশে তিনি নিঃস্ব ভিখারীর মত একাকী ভীত চকিতচিত্তে, কতই না বিভীষিকা দেখিতেছেন! হায়, রাজ্যেশ্বর রাজার কি এই পরিণাম? কর্ম্মফল ভোগান্তে, আবার হয়তো তাহাকে স্বকর্ম্মবশে সাধারণ নিঃস্ব প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইবে! বিচার করিলে, এ হেন ক্ষণস্থায়ী রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভের কামনা থাকে কি?

শ্মশান বিচার।

এক্ষণে ঐ মৃত ভিখারীর বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক; দুঃখে কষ্টে জীবনাতিপাত করিয়াও, যদি সে ভগবানকে স্মরণ মনন করিয়া থাকে, যদি জীবনে যথাসাধ্য ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক, ভগবানের নাম লইতে লইতে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে মরণের যবনিকার অন্তরালে, আজ তাহার জন্য কি আনন্দ নিহিত আছে, তাহা একবার ভাবুন দেখি! তাহার পক্ষে অজানা দেশ নাই, সেখানে সকলেই তাহার বন্ধু, সকলেই যেন চির পরিচিত! তাই জনৈক সাধক মৃত্যুর সময়ে গাহিয়াছিলেন :—

"আমার স্থিরনেত্র দেখে তোরা, সবাই বলছিস্ হরিবোল্।
আমিতো ভাই স্থির নয়নে; দেখছি শ্যামা মায়ের কোল।
ঐ যে মা আমার ব্যাকুলা হয়ে, দুটী বাহু প্রসারিয়ে,
বলছেন আমার কোলে আয় বাপ, কি ভয় দুরন্ত শমনে!!"

তাই বলি, এ জগতের সুখ দুঃখের কোন মূল্য নাই। অতএব, অনিত্য বিষয়ে আসক্তি, বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বিষয়ে অনুরক্তি হওয়ার অনুশীলন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনাসক্তভাবে শুধু কর্ত্তব্য বোধে আপন আপন স্বধর্ম্ম যথাযোগ্য ভাবে পালন করতঃ ভগবানের সংসারে সংসারী হইয়া, তাঁহারই উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

আসক্তি পরিহারের নাম ত্যাগ বা বৈরাগ্য; বৈরাগ্য না হইলে ভক্তি-লাভ হয় না। এই ত্যাগ বৈরাগ্য অর্থ, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনবাস করা নহে, বরং বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করাই প্রকৃত ত্যাগ বৈরাগ্য!

বৈরাগ্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গম সংবলিত সমুদয় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও, মমতা পরিত্যাগ করিতেপারেন, তাহাকে কথনও সংসার পাশে বদ্ধ হইতে হয় না; আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াও বিষয় বাসনা

পরিত্যাগ করিতে পারে না তাহাকে নিশ্চয়ই সংসার জালে পুনরায় জড়িত হইতে হয়।" ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।"

সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকে অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করাকেই পণ্ডিতগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন।

জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,—

"যত্ত্যক্তা মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি রাঘবঃ।"

যোগবাশিষ্ঠ

হে রামচন্দ্র মন হইতে যাহা ত্যাগ করা যায় তাহাই প্রকৃত ত্যাগ বলিয়া জানিবে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ত্যাগোঽসি কিমস্তি? আসক্তি পরিহারঃ।" অর্থাৎ ত্যাগ কি?—আসক্তি পরিহার॥

এইরূপে বিবেক বৈরাগ্য বলে আসক্তিকে ভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ভগবানের প্রতি জীবের রতি বা ভক্তি স্বাভাবিকী, কেননা জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ, আবার নিজ আত্মার মত ভালবাসার পাত্র আর জগতে কিছুই নাই, সুতরাং একবার আত্মস্বরূপ সেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইলে, কোন পার্থিব আসক্তিই তাহাকে আর লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিবে না! আমাদের যে আত্মাতে বা ভগবানে রতি হয় না, ইহা মহামায়ারই অসীম প্রভাব! তবে শক্তি বা শক্তিমানের কৃপা হইলে মহামায়ার বন্ধনও মুক্ত হইতে পারে, কেন না, যাহার বন্ধন করার ক্ষমতা আছে, তাহার মুক্ত করার ক্ষমতাও অবশ্যই আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধন কাটিবার জন্য ভগবানে শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়স্কর। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ;—

"দৈবীহ্যেষাগুণময়া মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥"

আমার ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী মায়া অতিশয় দুস্তরা, তবে যাহারা আমার শরণাপন্ন হয় তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

নাম সঙ্কীর্ত্তন।

দেবত্ব ও ভক্তি লাভের আর একটী বিশেষ উপায় নাম সঙ্কীর্ত্তন। ইহার মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, পবিত্র ও সহজ সাধন আর নাই। তাই, স্বল্পায়ু, মোহলুব্ধ, বিপথগামী কলির জীবের জন্য, দয়ার ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, জাতি ধৰ্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই সহজসাধ্য নাম প্রেমানন্দে বিলাইয়াছেন। এই নাম উচ্চৈঃস্বরে যখন জপ করা হয়, তখন তাহাকে কীর্ত্তন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, আর যখন মনে মনে অথবা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, তখন "জপ" বলিয়া উক্ত হয়। সর্ব্ববিধ সাধনের ফল একমাত্র নাম দ্বারাই লাভ হইতে পারে। এই নামের বলে, একাধারে চিত্তের একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধি উভয়ই সাধিত হয়। নাম দ্বারা সকামীর কাম্যফল, যোগীর যোগফল, জ্ঞানীর মোক্ষফল, আর ভক্তের ভগবৎ প্রাপ্তি ফল লাভ হইয়া থাকে! এক কথায়, ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল নাম দ্বারাই লাভ হইতে পারে। তাই মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব জলস্থল নভোমণ্ডল প্রকম্পিত করতঃ গগন ভেদী উচ্চরোল তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "হরিবল, হরিবল!" "হরিনাম বিনা জীবের গতি নাহি আর!" তাই তিনি জীবদুঃখে দুঃখী হইয়া

ত্রিতাপ তাপিত জীবকে শান্তির সুশীতল জলে স্নাত করাইয়া প্রেমামৃত প্রদানে অমর করিবার জন্য ত্রিসত্য করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

নাম আর নামী অভিন্নবস্তু, ইহা সকল শাস্ত্রকারগণই স্বীকার করিয়া থাকেন, এই জন্যই নাম এত মধুর। তাই ভক্ত সানন্দে গাহিয়াছেন,—

নাম, বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর মধুর ভকতি যোগে,
(নাম) যতই করি গান, যতই করি পান, মধুর মধুর লাগে,
যার, নামে এত সুধা ঝরে, তাঁর প্রেমে নাজানি কি করে,
কি আনন্দ পেলে তাঁরে, যার জাগে তার জাগেরে॥"

অহংকার পরিত্যাগ করতঃ দীনতা অবলম্বনে, সমাহিত চিত্তে ও বিশ্বাসের সহিত নাম সাধন করিলে অতি সহজেই ফল লাভ হয়, তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

অর্থাৎ তৃণ হইতেও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু, নিজে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এবং অপরকে সম্মান দিয়া হরিনাম করিবে।*

* কেহ কেহ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকে যে, সাধারণের হরিনাম লওয়ার অধিকার নাই। কেননা মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন, তৃণ হইতে নীচ, বৃক্ষ হইতে সহিষ্ণু এবং অভিমান শূন্য হইয়া হরিনাম করিবে, সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী না হইয়া হরিনাম করিলে প্রত্যবায় আছে, কিন্তু এরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করা সমিচীন নহে, কেননা মহাপ্রভুর ঐরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঐরূপ অধিকারী হইয়া হরিনাম লইলে হরিনামের যথাযথ আস্বাদন ও ফললাভ হইবে; হরিনাম লইতে কাহারও বাধা নাই, তবে হরিনাম লইতে লইতে নামের বলে ঐ সকল অধিকার আপনা আপনি আসিবে, তখন যথাযথ আস্বাদন হইবে। —লেখক

এই হরিনামের যথাযথ আস্বাদন বুঝিয়াছিলেন যবন হরিদাস ; ত কাজির আদেশে বাইশ বাজারে প্রহৃত ও বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি আঘাতকারীগণের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন ;—

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ যায় যদি প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম"

ভগবান বলিয়াছেন ;—

"এষুসন্তাপেষু যদি মাং ন পরিত্যজেৎ।
দদামি স্বীয় পদবীং দেবানামপি দুর্ল্লভাম্ ॥"

এই প্রকার ভীষণ কষ্টে পড়িয়াও যদি ভক্ত আমাকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বিস্মৃত না হয়, তাহা হইলে দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ আমার স্বীয় তাহাকে প্রদান করিয়া থাকি।

ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন ;—

"ওঁ সংকীর্ত্তমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্।"

নারদসূ

অর্থাৎ তিনি কীর্ত্তিত হইলে শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে তাঁহ আবির্ভাব অনুভব করাইয়া দেন!

ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

"নাহংতিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েনচ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকিনা, যোগীগণের হৃদয়েও থাকিনা, আম ভক্তগণ যেখানে আমার গান করে, সেইখানেই অধিষ্ঠান করি।

শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন ;—

"তত্রৈব গঙ্গা যমুনাচ তত্র গোদাবরী সিন্ধুঃসরস্বতীচ
সর্ব্ব তীর্থানি বসন্তিতত্র যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ ॥"

যেখানে ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন হয় সেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী গোদাবরী সিন্ধু প্রভৃতি সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

হরিনামের প্রভাবে মহাপাপীও উদ্ধার হয়। জগাই মাধাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আবার শাস্ত্রেও আছে, যথা বৈশম্পায়নে,—

"সর্ব্ব ধর্ম্ম বহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপ রতস্তথা।
মুচ্যতেনাত্র সন্দেহোবিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥"

অর্থাৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগী সর্ব্বপাপ নিরত ব্যক্তিও যদি হরিনাম সংকীর্ত্তন করে, সেও পাপমুক্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে হরিনামের দোহাই দিয়া যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের সহজে নিস্তার নাই যথা, পাদ্মে;—

"নাম্নো বলাদ্‌যস্যহি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধিঃ ॥"

অর্থাৎ নামের বলে যে পাপাচরণ করে, যমালয়ের কঠোর শাস্তি দ্বারাও তাহার পাপ ক্ষালণ হয়না।

অতএব সকলে অনন্যচিত্ত হইয়া, সরল বিশ্বাসে ভক্তি-ভরে প্রেমানন্দে বলিতে থাক "**হরের্নামৈব কেবলম্।**" একনিষ্ঠ ও আত্মহারা হইয়া উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, চলিতে ফিরিতে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ কর "**হরি ওঁ**"—ইহাই বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম ও সাধনা !!

চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রতা।

দেবত্বাদি আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের প্রধান সাধনা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রতা এই সাধনা দুইটী সকল সাধনার মূল, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কো সাধনাই হইতে পারেনা। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইহাদিগকে অবল করিতে হইবেই হইবে। এই সাধনা দুইটী সম্বন্ধে সমগ্র জগতের বি ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়না, সকলেই ইহা সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। চিত্তশুদ্ধি সনা ধর্ম্মের সার। অশুদ্ধ চিত্তদ্বারা কোন সাধন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় কোন সাধনাই সফল হয়না; এজন্য সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দেবত্বের প্রধান তিনটী লক্ষণ সংযম, পরার্থপর এবং ভগবৎপরায়ণতা; প্রথমটীর সাফল্যে হৃদয়ে শান্তিলাভ, দ্বিতী সাফল্যে জীবে প্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টীর সফলতায় ভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে। এই তিনটী লক্ষণ চিত্তশুদ্ধির সহিতও বিশেষভাবে জ আছে; ক্রমে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সংযম সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কতক আলোচনা করা হইয়াছে; স অর্থে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উচ্ছেদ বা বিনাশ নহে, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনু সমাহিত চিত্তে, অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার নাম ই সংযম। যাহার চিত্ত শমিত, ইন্দ্রিয়গণ দমিত হয় নাই, তিনি পণ্ডিত হই মূর্খ! কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কুতর্ক, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, স্বেচ্ছাচা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদির অসংযত ব্যবহার, এই স অসৎভাব গুলিই চিত্তশুদ্ধির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। সংযম অভ্যাস ইহাদিগকে উচ্ছেদ না করিলে কিছুতেই চিত্তশুদ্ধি হইবেনা বা চিত্তে

াসিবে না! সুতরাং চিত্তশুদ্ধির প্রথম উপায়, সংযম অভ্যাস দ্বারা ন্তিলাভ।

দ্বিতীয়তঃ পরার্থপরতা; স্বার্থপরতার বিপরীত বৃত্তিই পরার্থপরতা। স্বার্থপরতাই চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। স্বার্থত্যাগ করিতে না রিলে জগতে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায়না; ামিত্বের সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ প্রসাবের অভাবই স্বার্থপরতার মূল কারণ। নেক হিন্দুস্থানী তাহার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল "দেখো, ই বোলো, জরু বোলো লেড়্‌কা বোলো, কোই আপনা নেহি, কোই কুছ হি, যো বদনমে দিয়া যাতা হ্যায়, ওহি আপনা!" অর্থাৎ ভাই উক, স্ত্রী হউক, আর ছেলেই হউক, ইহারা কেহই আপনা নহে, বা কেহই কিছু নয়; তবে যাহা মুখে দেওয়া যায় অর্থাৎ আহার রা যায় উহাই একমাত্র আপনা! আহার্য্যদ্রব্য স্ত্রীপুত্র হইতেও আপন? ভীষণ স্বার্থপরতা! মানুষ স্ত্রীপুত্রের জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া কে, অন্ততঃ স্ত্রীপুত্র আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তাহার আমিত্বের প্রসার য় থাকে, কিন্তু উপরোক্ত, ব্যক্তি সংসারের সাধারণ নিয়মও অতি ম করিয়াছে। যখন পরকে আপন জ্ঞান হইবে, পরের দুঃখকে আপন খ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিব, আমার আমিত্বকে গ্রামবাসীর জন্য, শবাসীর জন্য, বিশ্ব হিতের জন্য ছড়াইয়া দিতে পারিব, তখনই চিত্ত শুদ্ধি য়া "জীবে প্রীতি" + লাভ হইবে।

তৃতীয়তঃ ভগবৎপরায়ণতা; ইহাই চিত্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি

প্রীতিই আনন্দ; নররূপী নারায়ণ সেবাদ্বারা বিশেষরূপে আত্মপ্রসাদ ও নন্দ লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ "সচ্চিদানন্দ", ইহারই নামান্তর অস্তি- ত প্রীতি; অর্থাৎ অস্তি (সৎ) ভাতি (চিৎ) প্রীতি (আনন্দ)। সুতরাং াতি" ভগবানের স্বরূপ আনন্দ।

নিত্যশুদ্ধ ও সমস্ত শুদ্ধির আকর, যাহার স্মরণমাত্র অন্তর বাহ্য শুচি হইয়া যায়, যাহার নামে শুদ্ধি, জপে শুদ্ধি, চিন্তায় শুদ্ধি, তাঁহাতে অনুরক্তি হইলে যে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সর্ব্ব শুদ্ধির শুদ্ধি, চিন্ময় সেই চিন্তামণিকে হৃদিকমল-আসনে চিন্তা করিতে পারিলে, আর কি চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে পারে ? আর কি হৃদয়ে মলিনতা থাকে ? সুতরাং ভগবৎপরায়ণতা দ্বারা ভক্তি লাভ করাই চিত্ত শুদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ ; এজন্য চিত্ত শুদ্ধি সাধনে আহার শুদ্ধিও প্রয়োজন। যাহার যেরূপ চিন্তা করিতে হয় তাহার সেইরূপ সমগুণ সম্পন্ন আহার্য্য গ্রহণ করা উচিৎ ; কেননা, কঠোর পরিশ্রমী শ্রমজীবি যদি শুধু সাত্বিক আহার করে, তবে তাহার দেহ রক্ষা হইবে না ;* সুতরাং যাহাদের শুধু সাত্বিক চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে সাত্বিক আহারই বিধেয়। আর যাহাদের চিন্তা সত্ব ও রজগুণ প্রধান, তাহাদের খাদ্যও সেইরূপ হওয়া উচিত। তবে সাত্বিক ভাব ব্যতিত ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়না।

সংযমাদি চিত্তশুদ্ধির সাধনার সার্থকতা ভগবদ্ভক্তি ; নতুবা ভক্তিহীন সংযম, শুষ্ক তরুর ন্যায় নিরস ও প্রাণহীন। চিত্তশুদ্ধি অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, তখন সেই নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে ভগবানের জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া ভক্তকে আনন্দে আত্মহারা করিয়া দেয়, পরম করুণাময় ভগবান সর্ব্বদাই তাঁহার সাধের জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু জীবের অশুদ্ধ চিত্ত তাহা অনুভব

---

* এই প্রকার বিধান সার্ব্বভৌমিকভাবে লিখিত হইল ; ব্যক্তিগত ভাবে যিনি যেরূপ শ্রেয়ঃ মনে করেন, কিম্বা যাহার যেমন সহ্য হয, সেইরূপ ব্যবস্থা করা বিধেয়—লেখক।

করিতে পারিতেছেনা। লৌহ যেমন মলিনতা লিপ্ত থাকিলে, চুম্বকের আকর্ষণে সাড়া দেয় না, আবার যে মুহূর্ত্তে উহা পরিষ্কৃত হইয়া মলিনতা শূন্য হয়, অমনি চকিতে চুম্বকের সহিত মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা চিত্তের মলিনতা ধৌত হইলেই, ভগবানের মহা আকর্ষণে জীবের চিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে লীন হইয়া যায়! তখন চিত্তচকোর শ্রীপাদপদ্মারবিন্দের মকরন্দ পানে বিভোর হইয়া চিরতরে আনন্দরসে মগ্ন হইয়া যায়!!

অতঃপর চিত্তএকাগ্রতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতিত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এই চিত্ত একাগ্রতার অপর নাম 'মনস্থির'। যাহাই করা যাউক না কেন, তাহাতে মনসংযোগ না হইলে কোন কর্ম্মই হইবে না। মনের গতি প্রবৃত্তিমুখী স্বাভাবিকই ধাবিত হয়, বিষয় চিন্তায় মন বেশ স্থির থাকে। কিন্তু মনকে বহির্ম্মুখী বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্ম্মুখী বা ভগবৎমুখী করিতে প্রয়াস পাইলেই, মন বিশেষ উশৃঙ্খল হইয়া উঠে! মন সততই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের পথে বহু শাখায় বাহিরে বাহিরেই কেবল ছুটিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে! সতত বহির্ম্মুখী বিচরণশীল এই মনকে স্থির ও একাগ্র করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম জগতের কোন সাধনই হইবে না; মনস্থিরই সর্ব্ববিধ সাধনার মূল।

যেমন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন ছটায় ছড়াইয়া পড়ায়, উহাতে দাহিকা শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, আতস পাথর সংযোগে কয়েকটী রশ্মি একত্রিত হওয়া মাত্র তাহা হইতে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ জীবের মানসিক বৃত্তিগুলি অসংখ্য কেন্দ্রে ছড়াইয়া পরায়, আত্ম-শক্তি উপলব্ধি হইতেছে না! নিজের ভিতরে অনন্ত শক্তি, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম নিহিত আছে তাহা কিছুতেই অনুভব হইতেছেনা, পক্ষান্তরে জীব

অশান্তির আগুনেই পুরিয়া মরিতেছে! এইজন্য অনাদিকাল হইতে ঋষি-পরম্পরায় মনস্থিরের বা চিত্ত একাগ্রতার অনন্ত সাধন কৌশল বিবৃত হইয়াছে, ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে এবিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ আখ্যা দিয়াছেন, যথা,—

"যোগোশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"

পাতঞ্জল।

সুতরাং একাগ্রতাসাধন দ্বারা অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিতে না পারিলে শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র!

এই চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা সম্বন্ধে একটী সরল দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা সুন্দররূপে মীমাংসিত হইবে।

মণির দৃষ্টান্ত

একটী চৌবাচ্চার জলে যেন একটা মণি পড়িয়া আছে, এক্ষণে যদি ঐ মণিটী দেখা না যায়, তবে তাহার কি কারণ হইতে পারে? প্রথম কারণ এই হইতে পারে যে, হয়তো চৌবাচ্চার জলটা ঘোলা, তাই মণিটা দেখা যাইতেছে না।—দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, চৌবাচ্চার জলটা হয়তো অতি স্বচ্ছ, কিন্তু সেই জলটা সতত তরঙ্গায়িত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাতে খুব তরঙ্গ খেলিতেছে, এই অবস্থা হইলেও মণিটা দেখা যাইবেনা। সেইরূপ আমরা যে আমাদের ভিতরে আত্মা বা ভগবান কিম্বা কোন প্রকার শক্তিই অনুভব করিতে পারিতেছিনা ইহারও মূলে উল্লিখিত কারণ দুইটী বিদ্যমান। অর্থাৎ হয়তো আমাদের চিত্ত অশুদ্ধ ও মলিনতা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাই আমাদের আত্মোপলব্ধি হইতেছেনা! অথবা যদি চিত্তে কোন প্রকার মলিনতা নাও থাকে, তথাপি আমরা বাসনা কামনা ও সঙ্কল্প বিকল্পের এমনই তরঙ্গ তুলিতেছি যে, তুলনা করিলে মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাও বুঝি আমাদের নিকট পরাস্ত হয়!

আর যেখানে উপরোক্ত দুইটী কারণই বিদ্যমান, সেখানকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়! অতএব চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তএকাগ্রতা সাধন সম্বন্ধে বিশেষ অনুশীলন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

দৈবজ্ঞ আসিয়া দুঃখ দারিদ্রক্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বলিল, "তোমার দুঃখ কিসের?—তোমার গৃহে বহু গুপ্ত ধন, বহু মণিমাণিক্য প্রোথিত আছে—তুমি রাজরাজেশ্বর! গুপ্ত ধন উত্তোলন করতঃ দুঃখের অবসান করিয়া আনন্দ ভোগ কর।" তৎপর ঐ ব্যক্তি দৈবজ্ঞের উপদেশমত কার্য্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইল।

দৈবজ্ঞের দৃষ্টান্ত

মানবেরও ঠিক এই দশা হইয়াছে! আপনার গৃহের খবর আপনিই জানেনা!—আপনার দেহেতে যে কি অমূল্য রতন, কি অতুল ঐশ্বর্য্য, কি পরম আনন্দ নিহিত আছে তাহা না জানিয়া বাহিরে বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে!—নিজের বিষয় ভুলিয়া বাহিরের বিষয়ে সুখের অনুসন্ধান করিয়া ভ্রান্ত হইতেছে!—নিজকে দীন, হীন, পাপী, তাপী, দুঃখী ইত্যাদি কল্পনা করিয়া প্রকৃতই দীন হীন দুঃখী হইয়া পড়িতেছে! কিন্তু দৈবজ্ঞের মত সদ্গুরুর কৃপায় যদি মানব একবার জানিতে পাবে যে, তাহার ভিতরেই সমস্ত আনন্দ নিহিত আছে—সে নিজেই আনন্দের উৎস, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তখন আর বাহিরের বিষয়ে মুগ্ধ হয় না, তখন গুরুর উপদেশ মত চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্র করিয়া আত্মস্বরূপ বা ভগবৎ দর্শন করতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে!

ষট্‌ক সম্পত্তি।

দেবত্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের আর একটী সাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। এই সাধনাটীকে শাস্ত্রকারগণ "শমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টী অমূল্য সম্পত্তি লাভ, এই সাধনার উদ্দেশ্য। শম কি?—অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ মনকে বশীভূত করার নাম শম। মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় উন্মত্ত এই মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন, অথচ এই মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে সাধন ভজন কিছুই হইবে না; মনই বন্ধনের কারণ। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

> মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
> বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং॥
>
> অন্যমনস্ক গীতা।

অর্থাৎ মনই মনুষ্যের বন্ধনের ও মুক্তির কারণ, কেননা মন বিষয়াসক্ত হইলেই বন্ধনের হেতু, আবার বিষয়েতে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য জন্মিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। মনকে বশীভূত করার জন্য শাস্ত্রকারগণ বহু উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মনটী সংযমিত হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি আপনিই বশীভূত হইবে—কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুও আপনা হইতে বিজিত হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ দম কি?—বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ, অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি বাহ্যইন্দ্রিয়গণের দমন বা সংযমের নাম দম। এখানে দমন অর্থে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলি উচ্ছেদ নহে, সংযত ও অনাসক্ত ভাবে অথবা ভগবৎ প্রীত্যর্থে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণের নাম দমন। কুনাট বা কুদৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া, ভগবানের রূপ অথবা মহিমা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হওয়াই দর্শনেন্দ্রিয়ের

সার্থকতা! যথার্থ দর্শন করিতেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, তাই বেশ্যার হস্তে হুকা দেখিয়া, উহাই জগন্মাতার রূপ ভাবিয়া, রূপ দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন! ইহাই প্রকৃত দর্শন! কুকথা শ্রবণ না করিয়া ভগবৎ কথা বা নাম শ্রবণই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা। এইরূপে সকল কার্য্যেই ভগবানকে মিশাইয়া লইয়া ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা বিষয় সেবন ও আপন আপন কর্ত্তব্য পালনই ইন্দ্রিয় দমন।

তৃতীয়তঃ উপরতি কি?—মনের প্রত্যাহারের নাম উপরতি *। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দর্শন শ্রবণাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমুখী গতি ফিরাইয়া, ভগবৎ রূপ বা মাহাত্ম্য দর্শন, ভগবৎ কথা বা নাম শ্রবণাদিতে রতি হওয়ার নাম উপরতি। এক কথায় ভগবান সম্বন্ধে অনুরাগ হওয়ার নাম উপরতি।

চতুর্থ, তিতিক্ষা কি?—দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা অর্থাৎ শীত উষ্ণাদি, সুখ দুঃখাদি বিপরীত বিষয় সকল সহ্য করার অভ্যাসের নাম তিতিক্ষা। সুখ দুঃখ সততই আসিতেছে, ত্রিতাপের তাপে জীবগণ সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত, এরূপ অবস্থায় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা লাভ করিতে না পারিলে, কিছুতেই শান্তি হইবেনা। এবিষয়ে প্রথম অধ্যায়োল্লিখিত তপের বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম, শ্রদ্ধা কি?—"গুরুবেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ." অর্থাৎ গুরু বাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। বিশ্বাসের মত শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর নাই! কি ভক্তি পথ, কি জ্ঞান পথ, কি যোগ পথ, কি তন্ত্র পথ, কোন পথেই বিশ্বাস ব্যতিত অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশ্বাসই সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম সাধনার মূল; বিশ্বাস না হইলে ভক্ত আর ভগবান বলিয়া কিছু থাকে না, বিশ্বাস না হইলে জ্ঞানীর সোহং তত্ত্ব বা ব্রহ্মত্ব কিছুই টিকেনা, বিশ্বাস না থাকিলে জ্ঞান-শাস্ত্র, ভক্তি-শাস্ত্র,

বিশ্বাস।

* কাহারও মতে বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ কর্ম্ম সন্ন্যাসের নাম উপরতি

কর্ম্ম-শাস্ত্র, সকলই বৃথা! বিশ্বাসের অভাব হইলে শাস্ত্রকার, মুনিঋষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, ভগবৎ অবতার জ্ঞানাবতার প্রেমাবতার সকলই অনন্তে বিলীন হইয়া যায়! সুতরাং সকলের মূল বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের বলেই ভক্ত ভগবানকে লাভ করিতেছে, জ্ঞানী ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতেছে! বিশ্বাসের বলে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইয়া ভক্তের সহিত আলাপ করিয়া ভক্তকে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন; শালগ্রাম শিলাও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে, অলঙ্কার পরিবার জন্য হস্ত বাহির করিয়া ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন। বিশ্বাসের ফলেই হরি-হর-বিধি আরাধ্য গোপীনাথ ভক্তের জন্য ননী চুরী করিয়া "ননীচোরা গোপীনাথ" নাম সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। সুর-নর সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও ভক্তের জন্য স্বীয় মহাপ্রসাদ চুরী করিয়া, জগতবাসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাই বলি, চাই শুধু জলন্ত বিশ্বাস!—ইহাই সর্ব্ববিধ সাধনার গূঢ় রহস্য!!

বর্ত্তমান যুগেও পাশ্চাত্য জগতে এই বিশ্বাস লইয়া বেশ খেলা চলিতেছে বিশ্বাসমূলক ইচ্ছাশক্তির বলেই হিপনটিজম্ (Hypnotism) মেছমেরিজম্ (Mesmerism) ক্লারভয়েন্স (Clairvoyance) প্রভৃতি নানা প্রকার বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র বিদ্যার প্রভাব দর্শনে আজ জগৎবাসী মুগ্ধ হইতেছে। কিন্তু সনাতন-ধর্ম্মে যে মহাবিদ্যা, বা মহারত্ন লুক্কায়িত আছে, বিশ্বাসের বলে যে সেই বিদ্যা ও রত্ন লাভ হইতে পাবে তাহা অনেকেরই প্রতীতি হইতেছেনা! ইহার কারণ, বিশ্বাসের অভাব; আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই, দেশের উপর, ধর্ম্মের উপর, আত্মার উপর, ভগবানের উপর, কাহারও উপরই বিশ্বাস নাই!—এই বিশ্বাসের অভাবই ভারতের অধঃপতনের মুল কারণ!

আর্য্যঋষিগণ কঠোর সাধনা করিয়া অমৃত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, নীতি, শরীরপালন প্রভৃতি সকল

বিভাগেরই তন্ন তন্ন করিয়া চরম মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগ, তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের প্রতিভা, তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের ভক্তি, তাঁহাদের কর্ম্ম, জগতে অতুলনীয়! বর্ত্তমান যুগের কাহারও সহিত তাঁহারা তুলিত হইতে পারেন না! বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ধর্ম্মবল, আয়ুবল, স্বাস্থ্যবল, ধনবল, সকলপ্রকার বলেরই অভাব। অভাবের তাড়নায় প্রত্যেকেই ব্যস্ত ; ধর্ম্ম কর্ম্ম দূরের কথা, আপনার আশ্রিত-গণকে যথাযোগ্য প্রতিপালন করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে! এরূপ অবস্থায় কঠোর সাধনা করা কি নূতন কোন তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র! কলির জীব ভাগ্যবান, তাহাদের কঠোর সাধনার প্রয়োজন নাই! পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্ববিধ সাধনার অমৃতময় ফল তাহাদের জন্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।—চাই শুধু বিশ্বাস! একবার বিশ্বাসের সহিত সেই অমৃত ফল গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিলে, আমরা প্রেমানন্দ ও অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইব! তাহাহইলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে পরাশান্তি ও পরমানন্দ লাভ সুনিশ্চিত!!

ষষ্ঠ, সমাধান কি?—ভগবানে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান। ভগবানের উপর মন রাখিয়া, সর্ব্ব কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া, আপন আপন আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালন করাই সমাধানের উদ্দেশ্য। এই ভাবটী অবলম্বন করার জন্য গীতায় ভগবান নানাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনকে এবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, যথা ;—

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়িসন্নস্য মৎপরাঃ।
অনন্য যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্‌॥—গীতা

হে পার্থ, যাহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করতঃ মৎপরায়ণ হইয়া, একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যেই এই মরণশীল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তথাহি ভগবৎ উক্তি,—

"মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যোমে ভক্ত সমে প্রিয়ঃ।"

গীতা

অর্থাৎ যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমাতেই মনবুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রিয়।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকেই লাভ করিবে।

এক্ষণে বিধি-বিষ্ণু সেবিতা, সুরাসুর পূজিতা, জগদারাধ্যা ভবানী ও ভবানীপতির অতুল রাতুল, অভয় চরণ-সরোজে প্রণতি পূর্ব্বক এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলাম।

"কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভূজগেন্দ্রহারং।
সদাবসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিতং নমামি॥"

ওঁ শান্তি ওম্।

হরি ওঁ তৎসৎ

সনাতন-ধর্ম্মে মানব-জীবন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরত্ব।

মানব জীবনের তৃতীয় লক্ষ্য ঈশ্বরত্ব লাভ। ঈশ্বরত্ব বুঝিতে হইলে, ঈশ্বরত্ব কি? ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? এসম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্রের মত কি এবং ঈশ্বরত্ব লাভে ভক্তের ভক্তিভাবের লাঘবতা হইবে কি না? এবিষয়ে জ্ঞানীগণেরই বা মত কি? এই সকল বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ঈশ্বরত্ব কি? বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অধীনতাই জীবত্ব আর স্বাধীনতাই ঈশ্বরত্ব।—মায়ামোহের অধীন হইয়া পরিচালিত হওয়া জীবত্ব; আর মায়ামোহ হইতে মুক্ত অবস্থাই ঈশ্বরত্ব! যখন মানব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির অধীন হইয়া, তাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া, ইন্দ্রিয়-সেবাতেই আত্মনিয়োগ করে, তখন সে জীব; আর যখন ইন্দ্রিয় ও তদীয় বৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিয়া, মানব জীতেন্দ্রিয় হয়, অর্থাৎ যখন ঐ সকল বৃত্তি তাহার অধীন ও আজ্ঞাধীন হইয়া পরিচালিত হয়, তখন সে ঈশ্বর তুল্য! এক কথায় শক্তির বশীভূত থাকাই জীবত্ব, আর শক্তিকে স্ববশে আনা ও তাহাদ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লওয়া ঈশ্বরত্ব। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন;—

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥"

অর্থাৎ পাশবদ্ধ হইলেই জীব, আর পাশ হইতে মুক্ত হইলেই শিব।

ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা (নিন্দা) কুল, শীল ও মান এই আটটী চিত্তবৃত্তি জীবের বন্ধনের কারণ, এজন্য শাস্ত্রে ইহারা পাশ বা বন্ধন-রজ্জুরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তিনি সদাশিব বা ঈশ্বরতুল্য। পরমহংসদেব বলিতেন "ঘৃণা লজ্জা ভয়, এই তিন থাকিতে নয়"।

পাশবদ্ধ জীবের দুঃখে আক্ষেপ করিয়া সাধক গাহিয়াছেন,—

"চিদানন্দ স্বরূপ যার নিত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন,
বিন্দুনাদ কলাতীত, সাক্ষীভূত সনাতন,
সেকিনা আজ মায়ার ফেরে পাশবদ্ধ কারাগারে,
অনিত্য বাসনা লয়ে মায়ার খেলা খেলিছেরে।"

ভগবান ও জীব স্বরূপতঃ এক! জীবভাব পরিত্যাগ হইলেই, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়। ভগবানের তটস্থলক্ষণ * বহু হইলেও স্বরূপলক্ষণ "সচ্চিদানন্দ।" জীবযতদিন পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দ লাভ না করিবে, অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই পূর্ণ শান্তি বা পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে না। কোন কোন ভক্ত সাযুজ্য ব্যতীত অন্যবিধ মুক্তিকে সেবাভিলাষে গ্রহণের এবং সাযুজ্যকে পরিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু ভগবৎ সাযুজ্যতা লাভ করিলেই যে ভগবানে লীন হইতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচিন নহে। কেননা সাযুজ্য আর বেদান্তোক্ত "নির্ব্বাণ" মুক্তি এক অবস্থা নহে।

সালোক্যাদি মুক্তি ভগবৎ সেবামুখী হইলে উহার যথার্থ সার্থকতা হয়, আবার ভগবৎ সাযুজ্যতা বা সচ্চিদানন্দ লাভ না করিলে ভগবৎ সেবাও

---

* যাহা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বব্যাপী লক্ষণ নহে, অর্থাৎ যাহা কোন কোন সময়ে বা কোন কোন অংশে বিদ্যমান, এরূপ পরিচ্ছিন্ন লক্ষণের নাম তটস্থ লক্ষণ, যথা "তজ্জলান" সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ, দয়াময়, সাকার, নিরাকার ইত্যাদি।

পূর্ণরূপে হইতে পারে না! কেননা সমান সমান না হইলে যথাযোগ্যভাবে সেবা করাও সম্ভবপর নহে! পক্ষান্তরে এই পঞ্চভৌতিক প্রপঞ্চময় অনিত্য দেহদ্বারা নিত্যলোকের নিত্য সেবা চলিতে পারেনা! সালোক্যাদিমুক্তি দ্বারা সেই নিত্য সেবাই লক্ষিত হইয়াছে। ভক্তগণ নিত্য-বৃন্দাবনে শৃগাল কুকুর, এমন কি বৃক্ষলতা হইতেও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন! ইহার কারণ, সেখানে ভাবময় দেহ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও মূলতঃ সকলেই সচ্চিদানন্দ উপাদানে গঠিত! সকলেই সমরসানন্দে ডুবিয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন! **ইহাই** ভাব বা নিত্যলোকের বিশেষত্ব! তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"সেথা আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়,
আনন্দের ফলমুল সব ছলিছে আনন্দ বায়,
নিত্যানন্দ ধামে সেথে কিছু নাই আনন্দ বই
পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়ী"

সুতরাং ঈশ্বরত্বলাভ ভক্তিভাব পরিপুষ্টির পরিপন্থী নহে বরং উহা একান্ত প্রয়োজন।

ভগবানের সহিত জীবের আরও একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। ভগবানের দেহ আর দেহী পৃথক্ নহে, উহা সমরস, অখণ্ড ও এক অর্থাৎ তাঁহার দেহে উপাদান গত, কি স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় * কোন প্রকার ভেদ নাই!

* স্বগত ভেদ যথা—রক্তমাংস ত্বকাদি, চক্ষু কর্ণাদি (জীবের দৃষ্টিশক্তি অতি সামান্য, সম্মুখ দেখিলে পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পারে না, এমনকি নিজের মুখ নিজে দেখিতে পারেনা, কিন্তু ভগবান সর্ব্বতশ্চক্ষু! তিনি সব দেখিতে পান, সব শুনিতে পান) স্বজাতীয় ভেদ যথা—স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহ ইত্যাদি। বিজাতীয় ভেদ যথা—দেহ, আত্মা ইত্যাদি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিবাক্য উক্ত ত্রিবিধ ভেদশূন্যত্বের পরিচায়ক যথা—ঈশ্বর কিরূপ? না—"একং"; এক অর্থাৎ স্বগত ভেদ শূন্য, "এব" অর্থাৎ স্বজাতীয় ভেদশূন্য, "অদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্য।

তাহার দেহদেহী সকলই সচ্চিদানন্দময়! কিন্তু জীবের দেহ দেহী (আত্মা) এক নহে, জীবের স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহ আছে, জীবদেহে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ বিদ্যমান, আর জীব-দেহ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদে পরিপূর্ণ। এইরূপে জীব নানাপ্রকারে ভগবান হইতে পরিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং জীবের এই ভেদভাব ও ব্যবধান দূর না হইলে অর্থাৎ স্বরূপত্ব লাভ না করিলে, প্রকৃতপক্ষে ভগবৎসেবা বা শান্তি লাভ কিছুই হইবেনা! অতএব ভক্তের পক্ষেও ঈশ্বরত্ব লাভ বাঞ্ছনীয়।

আর একটী বিশেষ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। এই বিশেষ ভাবটী এইযে, ভক্ত ইচ্ছা না করিলেও ভগবৎ স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরত্ব, আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে! কেননা যে সর্ব্বদা যাহার চিন্তা করে উহা স্নেহ অর্থাৎ ভালবাসা বশতঃই হউক, অথবা দ্বেষ বা শক্রতা মূলেই হউক কিম্বা ভয় প্রযুক্তই হউক, উহা দ্বারা সে তাহার ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম। ভগবানের চিন্তা ও ধ্যানে ভক্তের সমস্ত ভেদভাব দূরীভূত হইয়া, ভক্তও সচ্চিদানন্দময় হইয়া ভগবৎ সারূপ্য লাভ করে।

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল তাহাদ্বারা ভক্তেরও ঈশ্বরত্ব লাভের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষে এবিষয়ে পৃথক্ বিচার নিষ্প্রয়োজন, কেননা জ্ঞান সাধনে স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভই অন্যতম লক্ষ্য অতএব কি ভক্ত কি জ্ঞানী, কি যোগী কি কর্ম্মী, সকলেরই ঈশ্বরত্ব লাভ অন্যতম লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় কি? এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরত্ব লাভের উপায়।

আর্য্যঋষিগণ নানাশাস্ত্রে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরত্ব লাভ সম্বন্ধে বহু উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটী উপদেশ এখানে উল্লেখ করা হইল

ঈশ্বরত্ব লাভের অন্যতম উপায় ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান। অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক ভগবানের লীলা-প্রসঙ্গ চিন্তা ও কীর্ত্তন, স্তোত্রাদি পাঠ ও অনন্যচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিলে ভগবৎ স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে,—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

অর্থাৎ যাহার যেরূপ ভাবনা বা চিন্তা তাহার সেইরূপ সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"অনন্যভক্ত্যা তদ্ বুদ্ধির্বুদ্ধি লয়াদত্যন্তম্॥"

অনন্যচিত্তে ভক্তিদ্বারা বুদ্ধির অত্যন্ত লয়হেতু তন্ময়ী বুদ্ধির উদয় হয়; অর্থাৎ তন্ময়তা বা ভগবৎ স্বরূপতা লাভ হয়!—একান্ত ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা, চিন্তা ও ধ্যান ধারণাদি করিলে, জীব সকল প্রকার ভবভাব বিবর্জ্জিত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি যথা,—

"যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥

যেমন গহ্বর মধ্যে প্রবেশিত কীট (তৈল পায়িকা বা আশুর্লা) পেশস্কৃত নামক ভ্রমর বিশেষের (কাঁচপোকা বা কুমারিকা পোকা) নিরন্তর পরিচিন্তনে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করতঃ ভ্রমরের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্নেহ বা ভালবাসা বশতঃই হউক, কি দ্বেষ বা শত্রুভাবেই হউক, কি ভয় প্রযুক্তই হউক, যে যাহার বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করে সে তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বন্ধুবান্ধবের কথা সর্ব্বদা মানুষের মনে জাগ্রত থাকেনা, কিন্তু শত্রুর বিষয় ভোলা যায় না, শত্রুর কথা সর্ব্বদাই মনে জাগরূক থাকে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, এই জন্য ভীষণ শত্রুতা করিয়াও কংশ, শিশুপাল প্রভৃতি ভগবৎ বিদ্বেষীগণও মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

কংশ শুনিয়াছিল দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই তাহাকে বিনাশ করিবে। এই ভয়ে আপন সহোদরা দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া পর পর তাহাদের সাতটী গর্ভজাত সন্তান বিনষ্ট করিল, তৎপর যশোদানন্দিনী ভগবতী মহামায়াকেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বোধে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলে, দেবী অষ্টভূজা মূর্ত্তিতে অন্তরীক্ষে প্রকটিতা হইয়া কংশকে দৈব বাণী শুনাইয়াছিলেন যে, গোকুলের কৃষ্ণই তাহাকে বিনাশ করিবে। সেই হইতে কংশ কৃষ্ণ বিনাশ করার জন্য নানাপ্রকার উপায় চিন্তা ও চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে পুতনাকে প্রেরণ ও গুপ্তচরাদি প্রেরণ করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া, কংশ বড়ই ভীত ও অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে কংশের অন্তর কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল, চক্ষু মুদ্রিত করিলেও কৃষ্ণ, বাহিরেও কৃষ্ণ, সর্ব্বত্র কৃষ্ণের দর্শন হইতে লাগিল! তখন কংশেরও শ্রীরাধিকার ন্যায় "যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে" এই ভাব উপস্থিত হইল! পরিশেষে কংশ কৃষ্ণময় বিভীষিকা

শত্রুভাবে ভগবান লাভ।

দেখিতে দেখিতে, প্রলাপ কবিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

শক্রভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির আরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, চক্রদ্বারা তাহার শিরচ্ছেদন করিলে, শিশুপাল মরণান্তে সর্ব্বজন সম্মুখেই জ্যোতির্ম্ময় উল্কারূপে বাসুদেবেব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।* কঠোর তপস্যাপরায়ণ সাধুগণেরও যে সৌভাগ্য ঘটেনা, আজন্ম ভগবদ্বিদ্বেষী শিশুপালের সেই সৌভাগ্য কিরূপে হইল, এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থে ভগবান শুকদেব বলিয়াছিলেন, জন্মএয়াবধি বৈরভাব হেতু শিশুপালের বুদ্ধি একান্ত ভগবদাবিষ্ট হওয়ায় তিনি তৎ সারূপ্য প্রাপ্তিতে ভগবানের দেহে লীন হইয়া পরিশেষে পুনরায় তাঁহাব পার্শ্বদ হইয়াছিলেন।”—চিন্তার একাগ্রতাই তৎস্বরূপ প্রাপ্তির কাবণ।

“শক্রতাচরণ করিয়াও ভগবৎ সারূপ্য লাভ কবিতে পারা যায়” এই ভাবটী অতিসুন্দর এবং ইহা সনাতন-ধর্ম্মেব নিজস্ব সম্পত্তি! পাঠকগণ এই ভাবটী পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাইবেননা; বরং অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মমতে ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, কঠোর শাস্তি কিম্বা অনন্ত নরকেব ব্যবস্থাই রহিয়াছে। সুতরাং দার্শনিক যুক্তি পূরপূর্ণ এই ভাবটী ভারতের ও সনাতন-ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

ভয়প্রযুক্ত যে সারূপ্য লাভ হইতে পারে, তাহা উপরোল্লিখিত কীট ভ্রমরের দৃষ্টান্তে পাঠকগণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, এতৎ সম্পর্কে

* চৈদ্য দেহোত্থিতং জ্যোতির্ব্বাসুদেব মুপাবিশৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা॥
শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্দ ৭৪ অধ্যায় ৪৫ শ্লোক।

আরওএকটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। গাবো পাহাড়ে জনৈক ব্যক্তি একটী বড় ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গীয় লোকেরা কোন রূপে ব্যাঘ্রের কবল হইতে লোকটাকে উদ্ধার করে, তৎপর ঐ লোকটা ৮।১০ দিন জীবিত ছিল এই কয়দিন সে ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিত, ব্যাঘ্রের মত অঙ্গুলী ও নখগুলি প্রসারণ পূর্ব্বক আঁচড়াইতে চেষ্টা করিত, দন্ত বিকাশ করতঃ লোককে কামড়াইতে যাইত! পরে স্থানীয় লোকেরা উহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল; বন্ধন দশাতেও লোকটা ঐরূপ ব্যবহার করিত। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে অত্যন্ত ভয় প্রযুক্ত লোকটা ব্যাঘ্রত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। হয়তো জন্মান্তরে তাহার ব্যাঘ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব নহে।

ভয়ে সারূপ্য লাভ

নৃপতিকুল-তিলক মহারাজা ভরত বিপুল রাজ্য ঐশ্বর্য্য, আত্মীয় বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করতঃ কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন; দৈবাৎ একটী মৃগ শিশুর প্রতি তাহার মমতা হওয়ায় উহাকে সযত্নে লালন পালন করিতে থাকেন। এইরূপে ইহার প্রতি অত্যন্ত মমতাযুক্ত হইয়া মৃগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রয়াণকালেও মৃগের মমতা ও চিন্তা পরিত্যাগ করিতে না পারায় মরণান্তে তিনি জাতিস্মর * মৃগরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্নেহবশতঃ কিরূপে সারূপ্য লাভ হয় ইহা তাহার জলন্ত প্রমাণ! এখানে আরও একটী ক্ষুদ্র গল্প উল্লেখ করিয়া এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব।

স্নেহে সারূপ্য লাভ

* যাহারা পরজন্মে যে কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বজন্মের সমস্ত ঘটনা স্মরণরাখিতে পারেন, তাহাদিগকে "জাতিস্মর" বলে।

একটী রাখাল বালক প্রতিদিন মহিষ চড়াইত, তৎপর একদিন তাহার অভিভাবক তাহাকে বিদ্যা লাভার্থে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিল। গুরুগৃহে যাইয়াও রাখালটী সর্ব্বদা মহিষের চিন্তাই করিত, লেখা পড়া কিছুই করিতে পারিল না। গুরু মহাশয় দেখিলেন যে বালকটীর মহিষের চিন্তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লেখা পড়া কিছুতেই হইবে না, স্থতরাং তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, বালকটী একটী নিভৃত গৃহে বসিয়া সর্ব্বদা মহিষের চিন্তাই করিবে, তাহার আহারাদি সমস্তই ঐ গৃহে নির্ব্বাহ হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে বালকটী কেবল মহিষের চিন্তাই করিতে লাগিল, (কেননা ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক) ; এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, গুরুমহাশয় ছাত্রটীকে ডাকিয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন, কিন্তু দরজাটা বেশী উচু না থাকায়, বালকটী বলিতে লাগিল "আমি কিরূপে আসিব ? আমার শিং যে দরজায় বেধে যায়।" তন্ময় চিন্তায় বালকটী মহিষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। একাগ্র চিন্তার কি অভিনব ফল পাঠক দেখিলেন তো ?

ভগবানের রূপ চিন্তা, গুরুমূর্ত্তি চিন্তা এবং মহাপুরুষগণের মূর্ত্তি চিন্তা ও ধ্যান করিলে তৎ সারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। এই জন্যই ধ্যান-যোগের এত শ্রেষ্ঠতা। ধ্যানের গাঢ় অবস্থায়, ধ্যান ধ্যেয় ধ্যাতা এক হইয়া যায়. নিজের অস্তিত্ব ধ্যেয় বস্তুতে লীন হইয়া যায়! তৎপর ধ্যানের গাঢ়তম অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান বিকশিত হইয়া সাধককে পরমানন্দে আত্মহারা করিয়া দেয়! কারণ যে বস্তুকে যত বেশী জানা যায়, তাহার দিকে আকর্ষণও তত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধারণ ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ।

মন নিরাকার অর্থাৎ উহার কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, তবে যখন যে চিন্তা করা যায় মনও তদাকার কারিত হইয়া থাকে। যেমন একটী জবাফুল চিন্তা করিলে মনও একটী জবাফুল হইয়া যায়! সেইরূপ

ভগবানের রূপ চিন্তা বা ধ্যান করিলে মনও সেই সেই রূপ ধারণ করে। মনের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ ইহা যুগপৎ দুইটী বিষয় চিন্তা করিতে পারে না! নিয়ত একনিষ্ঠ মনে ভগবানের পরিচিন্তনে, সাধক ভগবানের ধ্যানে ও জ্ঞানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ সারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন।

অষ্টপাশ ছেদন

ঈশ্বরত্ব লাভের আর একটী উপায় অষ্টপাশ ছেদন। অষ্টপাশ কি?—

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ভৈরব যামল।

অর্থাৎ ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও মান এই আটটী অষ্টপাশ বা বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, জীবের স্বরূপত্ব লাভ হয় না। এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ ঘৃণা ত্যাগ; এই জগতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, প্রকৃত পক্ষে ঘৃণার বিষয় কিছুই নাই। যাহা একজনের ঘৃণার বস্তু তাহাই অন্য জনের নিকট পরম আদরের সামগ্রী। যে আচার ব্যবহার একদেশে ঘৃণিত হয়, সেই আচার ব্যবহারই অন্য দেশে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে! যে বিষ্ঠা অতীব ঘৃণার জিনিষ, তাহাই আবার এক শ্রেণীর লোক মস্তকে বহন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে! এমন কোন পশুপক্ষী

নাই, যাহা একদেশে না একদেশে সাদরে ভক্ষিত হয়! তাই বলি প্রকৃত পক্ষে ঘৃণার কিছুই নাই।

"রাগ-দ্বেষ" হইতেই এই ঘৃণার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম "রাগ" আর প্রাপ্তির অনিচ্ছার নাম "দ্বেষ"। এই রাগ-দ্বেষ জগতে বিশেষ রূপে ক্রিয়াশীল। কতকগুলি অবস্থা বা পদার্থের উপর মানুষের অনুরক্তি—অর্থাৎ রাগ, আবার কতকগুলির উপর বিরক্তি অর্থাৎ দ্বেষ! সুখের উপর বা অনুকুল বিষয়ের উপর আসক্তি বা রাগ, আবার দুঃখের উপর বা প্রতিকুল বিষয়ের উপর ঘৃণা বা দ্বেষ। এই রাগদ্বেষই দুঃখের কারণ! কেননা প্রতিকুল বিষয় জগতে সর্ব্বদাই থাকিবে, সর্ব্বদা প্রতিকুল অবস্থার সহিতই জীবন-সংগ্রাম করিতে হইবে! এরূপ অবস্থায় যিনি দুঃখ কিম্বা প্রতিকুল অবস্থাকে বরণ করিয়া লইতে পারেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে শান্তির অধিকারী হন! সুতরাং কিছুই ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয় শঙ্কা ত্যাগ; ভাবী ভয়ের নাম শঙ্কা বা আশঙ্কা। যথা—"এই ছেলেটীর অসুখ যদি ভাল না হয়," "এই কার্য্যটী যদি সফল না হয়", এই প্রকার দুঃশ্চিন্তার নাম শঙ্কা বা আশঙ্কা। আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, শাস্ত্রে আছে "**ভবিতব্যং ভবত্যেব**" অর্থাৎ যা হইবার তা নিশ্চয়ই হইবে, কেহই তাহা খণ্ডাইতে পারিবেনা। সুতরাং ভাবী ভয়ের আশঙ্কা করিয়া হা হুতাশ করিলে অশান্তি ভোগ ব্যতিত আর কিছুই লাভ হইবে না। অতএব শঙ্কা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ ভয় ত্যাগ; ভয়ের মূল কারণ—মৃত্যু! আমরা বাঘ ভালুককে ভয় করি কেন?—না, বাঘ ভালুকে খাইয়া ফেলিলে মরিয়া যাইব। সাপকে ভয় করি কেন?—সাপে কামড়াইলে মরিয়া যাইব। ভূত প্রেতকে ভয় করি কেন?—ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবে! এইরূপে প্রত্যেক ভয়ের কারণ

অনুসন্ধান করিলে মৃত্যু-ভয়ই ভয়ের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। সুতরাং এই মৃত্যু-ভয় দূর করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিলে, আর ভয় থাকিবেনা!

চতুর্থ লজ্জা ত্যাগ। কোন কোন সময় মানুষ চক্ষুলজ্জায় আপন কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিয়া থাকে, কেহবা সাধনভজনের ইচ্ছা থাকিলেও কেবল লোকলজ্জার ভয়ে তদাচরণ হইতে বিরত হয়, সুতরাং লজ্জাও একটী বিশেষ বন্ধন। ব্রজগোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনপ্রাণ সকলই অর্পণ করিয়া দিলেও লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না, তাই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণের চিত্তশোধনের নিমিত্ত, **"বস্ত্রহরণ"** লীলা দ্বারা তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। কেননা নিজের নিকট নিজের লজ্জা হয় না, কিম্বা আপনার প্রিয়তম জনের নিকটেও লজ্জা থাকে না, সুতরাং গোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণে মন প্রাণ সমস্তই অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে গোপীগণ আর শ্রীকৃষ্ণ অভেদ! তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া গোপী-গণের ভেদভাব কেন?—তাঁহাকে আপনা হইতেও আপনার না ভাবিয়া পরের মত ব্যবহার কেন?—তাই গোপীগণের ভ্রম সংশোধনের জন্যই ভগবানের এই লীলা চাতুর্য্য! এসম্পর্কে বিদুরের স্ত্রীর প্রেম ভাবটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ভগবান বিদুরের বাড়ীর বহির্দ্বারে আসিয়া বিদুরকে ডাকিলেন, বিদুর বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রী তখন স্নানান্তে বস্ত্র পরিধানের জন্য আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন সময় ভগবানের ডাক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; অমনি তিনি আত্মহারা হইয়া সব ভুলিয়া গেলেন!—উলঙ্গ অবস্থায়ই ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ভগবান আপন উত্তরীয়খানা পরিধানার্থে তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তখন তিনিও বিশেষ লজ্জিতা হইয়া দন্তে দন্তে জিভ কর্ত্তনকরতঃ কোনরূপে উত্তরীয়খানা আপন অঙ্গে জড়াইয়াই

প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত।

ভগবানের হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ঘরে কিছুই খাবার ছিলনা, কয়েকটী কদলীফল মাত্র ছিল, তিনি ঐ ফল কয়টী লইয়াই ভগবানকে খাওয়াইতে বসিলেন; কখন কদলীর খোসা ফেলিয়া কদলীটী ভগবানের মুখে তুলিয়া দিলেন, আবার কখনওবা কদলী ফেলিয়া দিয়া খোসাগুলিই খাওয়াইতে লাগিলেন! এইরূপে শেষ খোসাটী ভগবানের মুখে তুলিয়া দিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ ও বিদুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদুর ভগবানের মুখে খোসা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন আর বলিলেন "আরে সর্ব্বনাশী করিস্ কি?" অমনি বিদুরের স্ত্রী লজ্জিতা হইয়া ভগবানের মুখ হইতে খোসাটী কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন, আর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন নারদ বলিলেন, "দেনে ওয়ালা না হয় কাণা, খানে ওয়ালাও কি কাণা"" অর্থাৎ যিনি খোসা দিয়াছেন তিনি ভক্ত, ভক্ত ভগবানকে পাইলে এমন আত্মহারা হইয়াই থাকে; কিন্তু ভগবানতো ভক্তের ভুল সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন! তখন ভগবান বলিলেন "নারদ তুমি নিজে ভক্ত, তাই ভক্তের ব্যথাই বুঝিয়াছ, কিন্তু ভক্তকে পাইলে ভগবান যে আরও আত্মহারা হইয়া যায়, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই!—খোসা কোথায়?—আমি যে প্রেমামৃত খাইয়াছি।"

পঞ্চম জুগুপ্সা বা নিন্দা ত্যাগ; এই জগতে নিন্দার বিশেষ প্রভাব। পরনিন্দায় অনেকেই আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। নিন্দাদ্বারা আপনার চিত্তই কলুষিত ও মলিনতা প্রাপ্ত হয় সুতরাং নিন্দা বর্জ্জন করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ কুল ত্যাগ; কুলের অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে সাধনপথে উন্নতি হওয়া কঠিন। আমি কুলীন, শ্রেষ্ঠকুলে আমার জন্ম, এবম্বিধ অহংকার সাধনার অন্তরায়। ধর্ম্মাচরণে কুলীন অকুলীন নাই, উচ্চজাতি নীচজাতি নাই, অধিকারী হইলে সকলেরই সমান অধিকার। নীচকুলোদ্ভব

হইলেও কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। বেদকর্ত্তা ভগবান বেদব্যাস ধীবর কন্যারগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! রঘুকুল-তিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত "মিতালী" কবিয়া ছলেন! মহাভারতের উক্তি ;—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহিনো যো দ্বিজোঽপি শ্বপচাধম॥

অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ হইলে চণ্ডালও দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) হইতে শ্রেষ্ঠ আর হরিভক্তি বিহীন হইলে দ্বিজও চণ্ডাল হইতে অধম।

সুতরাং জাতিকুলের অভিমান পরিত্যাগ করতঃ সকলেরই সাধনপথে অগ্রসর হইতে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম শীল বা স্বভাব ত্যাগ ; সংস্কারানুযায়ী স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করিয়া স্ব-ভাবে বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা বড়ই কঠিন। কোন বিষয় নূতন শিক্ষা করা বরং সহজ, কিন্তু যে শিক্ষা বা কুশিক্ষা স্বভাবগত হইয়াছে উহা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। যে পাকা চোর, তাহার পক্ষে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করা বিশেষ কঠিন! এইজন্য আপন আপন কুস্বভাব বা কুসংস্কার পরিত্যাগ কবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করা কঠিন হইবে।

অষ্টম মান ত্যাগ ; মানযশের অভিমান থাকিতে ধর্ম্মজগতে উন্নতিলাভ হয় না। এজন্য শাস্ত্রকারগণ অভিমানকে "সুরাপান" রূপে এবং গৌরবকে রৌরব নরকরূপে বর্জ্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন। আবার প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবও "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি বচন দ্বারা অভিমান পবিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

মুক্তি।

ঈশ্বরত্ব লাভের একটী অন্যতম উপায় "মুমুক্ষুত্ব"। মুক্তির জন্য ঐকান্তিক বা তীব্র ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। মুক্তি কি? নিত্যানিত্য বিচারপূর্ব্বক অনিত্য বিষয়ে আসক্তিশূন্যতা ও নিত্য বিষয়ে অনুরক্তি বা ভক্তি দ্বারা স্বরূপত্ব লাভের নাম মুক্তি। এক কথায় স্ব-স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। অবস্থা ও অধিকারী ভেদে এই মুক্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। যথা সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, সাষ্টি ও নির্ব্বাণ বা কৈবল্য। যোগেশ্বর মহাদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

> সালোক্যমপি সারূপ্যং সাষ্ট্যং সাযুজ্যমেবচ
> কৈবল্যং চেতিতাং বিদ্ধি মুক্তি রাঘব পঞ্চধা॥
>
> শিব গীতা

হে রাঘব, সালোক্য সারূপ্য সাযুজ্য, সাষ্টি ও কৈবল্য এই পঞ্চবিধা মুক্তি বলিয়া জনিবে। আবার কেহবা সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তি মূলতঃ একপ্রকার ভাবাপন্ন হওয়ায় সারূপ্যকে বাদ দিয়া সালোক্য ভাবেরই অন্তর্ভূক্ত "সামীপ্য" নামক আর একটী মুক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। লোক পিতামহ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলিতেছেন,—

> মুক্তিস্তু শৃণুমে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধাং।
> সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপং তৎসমীপতা॥
> সাযুজ্যং তৎস্বরূপস্থং সাষ্টিস্তু ব্রহ্মণোলয়ং
> ইতি চতুর্ব্বিধা মুক্তি নির্ব্বাণঞ্চ তদুত্তরং॥

হে পুত্র, আমি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিষয় তোমাকে বলিতেছি

শ্রবণ কর। ভগবৎ লোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য, তাঁহার সমীপে বাস করার নাম সামীপ্য, তৎস্বরূপে অবস্থান করার নাম সাযুজ্য, ব্রহ্মের কোন প্রকার মূর্ত্তিভেদে লয়ের নাম সাষ্টি, এই চারি প্রকার মুক্তির পর "নির্ব্বাণ মুক্তি"।

ভগবানের সহিত একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি, অর্থাৎ যখন ভক্ত নিত্য-দেহ লাভ করিয়া নিত্য-লোকে বাস করে, সেই অবস্থার নাম "সালোক্য মুক্তি"; ঐ প্রকারে নিত্য-লোকে ভগবৎ সমীপে বাস করাকে সামীপ্য মুক্তি বলা হইয়া থাকে। ভগবানের সমান রূপ অথবা ভগবৎস্বরূপ লাভ করাকে সারূপ্য মুক্তি বলা হয়; ভগবানের সহিত সামান্য বা ঐক্যতা লাভ, অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ লাভের নাম সাযুজ্য মুক্তি। ভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উত্তম লোক প্রাপ্তিতে তৎ তৎ কর্ম্মের উত্তম ফল ভোগ হইয়া থাকে, এবম্বিধ মুক্তির নাম "সাষ্টি"। অথবা ভগবানের মূর্ত্তি বিশেষে লীন ও তাঁহার সমান প্রভাবশালী হইয়া, ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ করাকে সাষ্টি মুক্তি বলা হয়। আবার কেহ কেহ মনুষ্য দেহেই ভগবৎ তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির ক্ষমতা লাভকে "সাষ্টি মুক্তি" বলিয়া থাকেন। এই প্রকার মুক্তি উত্তম কর্ম্মদ্বারাও লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে কর্ম্মফল ক্ষয়ান্তে পুনরায় জন্ম বা দুঃখ ভোগ হইতে পারে, এজন্য জ্ঞানীগণ কর্ম্মজ-মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার নাম "নির্ব্বাণ" বা "বিদেহ" বা "কৈবল্য" মুক্তি। নির্ব্বাণ অর্থ আমিত্বের বিনাশ নহে বরং আমিত্বের পূর্ণ প্রসার বা সম্যক্ প্রতিষ্ঠার নাম নির্ব্বাণ! —জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন বা জীব ব্রহ্মের ঐক্যতার নাম নির্ব্বাণ মুক্তি। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

পঞ্চআশ্রয়।

ঈশ্বরত্ব লাভের আর একটী শৃঙ্খলাযুক্ত পন্থা "পঞ্চআশ্রয়," যথা—মন্ত্র আশ্রয়, নামাশ্রয়, ভাবাশ্রয় প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়। সাধনার প্রথম অবস্থায় মন্ত্র আশ্রয় ও নামাশ্রয় করিতে হয়, তৎপর সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া, ভাবাশ্রয় করিতে হয়, পরিশেষে সাধনার উচ্চতম অবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থায় প্রেমাশ্রয় কিম্বা রসাশ্রয় করিবার বিধান আছে যথা,—

"মন্ত্রনাম ভাব প্রেম আর রসাশ্রয়।
এই পঞ্চ রূপ হয় সাধন আশ্রয়॥
প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়।
প্রবর্ত্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশ্রয়॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

প্রথমতঃ সাধক ভক্ত ভগবানের মন্ত্র বিশেষ বিধি অনুসারে জপ, নাম জপ এবং নাম কীর্ত্তনাদি সাধনার অনুষ্ঠান করিবেন, তৎপর ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভাব কি?—ভক্তি সাধনায় উৎকর্ষ লাভ হইলে, ক্রমশঃ ভগবানে বা নামে নিষ্ঠা এবং রুচি উৎপন্ন হয়, উহাই ক্রমে রতি বা ভাবে পরিণত হয়, চিত্তের স্নিগ্ধতাকারিণী ভক্তি বিশেষের নাম ভাব। প্রেমের প্রথম অবস্থাই ভাব। শাস্ত্রে আছে যথা,—

"প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যাভিধীয়তে"

অর্থাৎ প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হয়। এই ভাব পরিপক্ক হইলে প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে। ভাব হইলে ভক্তের শরীরে অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

চিত্তের একাগ্রতা এবং ইষ্ট নিষ্ঠা, ভাব-সাধনের মূল। আপন আপন ইষ্ট দেবতার উপর একান্ত নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন ; নচেৎ "ভাবের ঘরে চুরী" হইলে লাভও তেমনি হইবে। পরমহংসদেব বলিতেন "ভাবের ঘরে যেন চুরী না হয়" অর্থাৎ আপন আপন ভাব ঠিক রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ভক্ত-প্রবর হনুমান বলিয়াছিলেন ,—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমল লোচনঃ ॥"

আমি জানি শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ পরমাত্মা হিসাবে অভেদ ! তথাপি কমল-লোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব।—ইহাই প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা।

ভাবাবস্থায় কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি ভগবৎ উদ্দেশ্যে অর্পণ করার জন্য ভক্তি শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন যথা ,—

"ওঁ তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানা
দিকন্তস্মিন্নেব করণীয়ম্ ॥"

নারদ ভক্তি সূত্র।

সমস্ত আচার ভগবানে অর্পণ করিয়া, কাম ক্রোধ অভিমানাদি যদি করিতে হয় তবে তাঁহারই উপরে করিবে।

অর্থাৎ কাম হইলে কাম রতি ভগবানে বা পরমাত্মায় অর্পণ কর। ক্রোধ হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া বল "কেন ভগবানকে পাইতেছিনা!" মদ বা অভিমান হইলে চিন্তা কর "আমার প্রভুর মত সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী আর কে আছে ?" রূপের মোহ হয় তো ভাব "আমার প্রিয়তমের মত মনোহর মদনমোহন রূপ আর কার আছে ?" ইত্যাদি।

এই প্রকারে ভক্তের চিত্ত ভগবানে সংলগ্ন হইয়া নানা প্রকার ভাবোদ্গম হইতে থাকে। তখন ভক্তচায়, পরম আনন্দ-কন্দ, পরম দয়াল ভগবানের

অতুল রাতুল যুগল চরণ-সরোজে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে!—ভক্ত চায়, অনন্ত মাধুরী পরিপূর্ণ লীলাময় ভগবানের মধুর হইতে মধুর অতি সুমধুর নামকীর্ত্তন ও লীলা প্রসঙ্গাদি শ্রবণ মনন ও স্মরণ করিয়া, মানব জনম সফল করিতে!—ভক্তের সাধ হয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অনন্ত প্রেমময় ভগবানের অভয় পদ কমলে ভূম্যবলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণিপাত করতঃ মস্তকের "উত্তমাঙ্গ" নাম সার্থক করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে!—আরও সাধ হয়, ভক্তের যথা সর্ব্বস্ব ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করতঃ আত্মবলি প্রদান করিয়া ধন্য হইতে! এইরূপে ভক্ত ভগবানের ভাবে আপ্লুত হইয়া তন্ময় হইয়া যায় এবং ভাবের চরম অবস্থায় ভাবময়-দেহে ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন হয়! তখন ভক্ত অপূর্ব্ব শান্তি ও প্রেমরসে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভকরে!!

শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের নামাদি শব্দ, মিলনাদি স্পর্শ, শ্রীমুর্ত্তির কান্তি প্রভৃতি যুক্ত রূপ, ঐ প্রকার রূপাদি সম্ভোগ জনিত রস এবং ভাবাদিগত গন্ধ প্রভৃতি ভক্তিযোগে ভাবাবেশে গ্রহণ করতঃ পরমানন্দ লাভ করাই ভক্তের চরম সাধ্য!—ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের "**রাসলীলা**"— ইহাই রাস লীলার গূঢ়তাৎপর্য্য!! শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে এই ভাবটীই অতি সুন্দর রূপে বিকশিত!!!

সাধকের এই প্রকার অবস্থায় প্রেমাশ্রয় হইয়াথাকে। তখন সাধক অন্তরে বাহিরে, স্থাবর জঙ্গম চরাচরে সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে ইষ্ট দর্শন করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার যুগপৎ এই অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় যে, "**সকলি তিনি, তাঁহারি সকল!**" এক ভাবে সর্ব্বত্র ইষ্ট দর্শন করেন, আবার অন্যভাবে সকলি তাঁহার ভাবিয়া বিশ্বপ্রেমে সকলকে জড়াইয়া ধরিতে চান!—ইহাই প্রেমের লক্ষণ। মহাকবি মহাত্মা সেক্সপিয়র প্রেমকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন "A volume in a word ocean

in a tear!" অর্থাৎ প্রেমের একটা কথার মধ্যেই একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক, আর এক ফোটা অশ্রুজলে মহাসমুদ্র নিহিত থাকে!"

সিদ্ধাবস্থায় কেহ কেহ "রসাশ্রয়" করিয়া থাকেন। ভগবানই সর্ব্ববি রসের আকর; সকল রসই তাঁহাতে বিদ্যমান! এই জন্য যাহার যে ভা বা রস তিনি সেই রস দ্বারাই রসিক-শেখর ভগবানকে পাইতে পারেন তাই সিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের নিত্য লীলায় নিমগ্ন থাকিয়া পূর্ণরসাস্বাদ করতঃ পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন।

আবার কোন কোন সিদ্ধ রসিক ভক্ত, সিদ্ধ নায়ক নায়িকাতে রসরাজ ভগবানের নিত্যলীলা মাধুর্য্য আরোপ করতঃ ভাবের চরম পরিপুষ্টিদ্বার পূর্ণানন্দ লাভ করিয়া নিত্যলীলায় লীন হন। রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস৷ রসিক ভক্তগণ এই শ্রেণীর সিদ্ধ বীরসাধক ছিলেন। রসতত্ত্ব ও সাধন অতীব জটিল এবং কঠোর; ইহা একমাত্র সিদ্ধ বীরভক্তগণেরই আচরণীয় সুতরাং দুর্ব্বল অধিকারী কিম্বা সাধকগণের পক্ষে এবম্বিধ সাধনার অনুকরণ কি আচরণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি

কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী সাধনার প্রশস্ত পথ। বাহ্য দৃষ্টিতে এই সাধনত্রয় পৃথক্ বোধ হইলেও, উহারা পরস্পর ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, উহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং উহাদের লক্ষ্যও এক। জ্ঞানীর লক্ষ্য ব্রহ্ম (সচ্চিদানন্দ), কর্ম্মী বা যোগীর লক্ষ্য আত্মা (সচ্চিদানন্দ ঘন) এবং ভক্তের লক্ষ্য ভগবান (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ)। এই ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান মূলতঃ এক, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত; তাই সাধক বলিয়াছেন—

"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ঈশ্বরের তিন নাম।" ভগবান শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন "যিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে বিহার করিতেছেন সেই ভগবানকে বার বার নমস্কার করিতেছি!" * সুতরাং ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অভিন্ন!

জ্ঞান ও ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন, কেননা সাধনা মাত্রই কর্ম্ম; সুতরাং কর্ম্মের সহিত জ্ঞানভক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আবার জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যেও বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান; ভক্তি ব্যতিত জ্ঞান লাভ হয়না, ইহা সার্ব্বভৌমিক মত। ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভক্তি জ্ঞানস্য কারণং।"

জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে এবং ভক্তিই জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

আর জ্ঞান ব্যতিত ভক্তির উৎকষ সাধন হয়না। আমার প্রিয়তমকে যতই জানিতে পারিব, ততই তাঁহাতে প্রাণের আকর্ষণ হইবে, ততই তাঁহার মহিমা ও মাধুরীমায় ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যাইব! চিৎ ছাড়া আনন্দের প্রকাশ হয় না, চিদানন্দ পরস্পর ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত! সুতরাং জ্ঞান ছাড়া ভক্তি কিম্বা ভক্তি ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। তবে জ্ঞানের মহিমাতে তাঁহাকে একবার অবগত হইয়া তাঁহাতে অনন্যচিত্তে শুদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে পারিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—

উল্কা হস্তো যথা কশ্চিদ্দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥

উত্তর গীতা।

যেমন উল্কা হস্তে করিয়া অন্ধকার মধ্যস্থিত কোন দ্রব্য অনুসন্ধান করতঃ

* শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ ৪ অধ্যায় ১৪ শ্লোক।

পরে সেই উল্কা পরিত্যাগ করা হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়কে অব হইয়া পরে জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় জ্ঞানের আপনিই চাপা পরে! সাধনার উচ্চাবস্থায় সাধকের মহিম-ভাব থাকেনা, সাধক তখন ভগবানের মাধুর্য্যরসে ডুবিয়া আত্মহারা হয়!

সুতরাং জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। দুইটী পাখ ও একটী পুচ্ছ ব্যতিত পাখী যেমন আকাশে উড়িতে পারেনা, একটীর অভা হইলেই যেমন তাহার পক্ষে আর ভালরূপে উড়িবার সম্ভাবনা থাকেন সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-আকাশে উড়িতে হইলেও জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এ তিনটী বিষয় একত্রে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। কেহ বলিয়া থাকেন জ্ঞা মিষ্টত্ব থাকিলেও বড়ই কঠিন, যেমন "মিশ্রি"; আবার কেহ বলিয়া থাকে ভক্তি কোমল বটে, কিন্তু তাহাতে মিষ্টত্ব কম, যেমন "দুগ্ধ", কিন্তু মিশ্রি সহিত দুগ্ধ কর্ম্মের আবর্ত্তনে মিশ্রিত হইলে অতি উপাদেয় জিনিষ প্রস্তুত হয় সেইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সাধনা দ্বারা সাধক স্বরূপত্ব বা সচ্চিদান লাভ করিয়া থাকেন।

বেদ বেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহার সারভূত গীতাক অমৃত ভগবান জীবকে প্রদান করিয়াছেন। এই গীতা কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি

গীতা

অপূর্ব্ব সমন্বয়! * গীতাতে এই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যথাযোগ্য আলোচনা হইয়া সকলেরই প্রাধান্য স্থাপি হইয়াছে। তাই অপূর্ব্ব সমন্বয় পরিপূর্ণ গীতারূপী কল্পতরুর সুশীতল ছায়

* কাহারও মতে গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় ভগবদ্ভক্তির উপাসনা কাণ্ড. আর তৃতীয় ছয়অধ্যায় জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কথিত হয়। প্রথমকা কর্ম্ম ও তৎত্যাগের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক "ত্বং" রূপী বিশুদ্ধাত্মা নিরূপণ হইয়াছে; দ্বি কাণ্ডে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তি মার্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক "তৎ" রূপ পরমানন্দ পরমাত্মা নিরূ হইয়াছে; আর তৃতীয়কাণ্ডে তৎ ও ত্বং এই উভয়ের মিলন বা ঐক্যতা সাধিত হইয়া অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাব নিরূপিত হইয়াছে।

গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিবার জন্য আজ সমগ্র পৃথিবীর নরনারী
, হইতেছে!

গীতায় কর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ভগবান বলিয়াছেন ;—

"নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি॥"

হে পার্থ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, অতএব আমার কোনপ্রকার কর্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি! অর্থাৎ "কর্ম্মযোগ অবশ্য কর্ত্তব্য" ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই দেখাইলেন।

গীতায় জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ভগবান বলিয়াছেন,

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

অর্থাৎ জ্ঞানের মত পবিত্র এজগতে আর কিছুই নাই।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

গীতা।

হে অর্জ্জুন, আর্ত্ত (শরণাগত) জিজ্ঞাসু (ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী) অর্থকামী (সকাম ভক্ত) এবং জ্ঞানী, এই চারি প্রকার পূণ্যবান লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ভক্তিপরায়ণ একনিষ্ঠ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানীগণের এবং জ্ঞানীগণ আমার একান্ত প্রিয়।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাংশান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি॥

শ্রদ্ধাবান (গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী) একনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

গীতায় ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে বহু উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী এখানে উদ্ধৃত করা হইল যথা,—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে, কেননা তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর, সে অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য-শান্তি প্রাপ্ত হয় ; হে অর্জ্জুন, তুমি নিশ্চয় জানিবে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

গীতার মত অপূর্ব্ব গ্রন্থ আর নাই ; ত্রিতাপ তাপিত জগতে, গীতা শান্তির সুশীতল প্রস্রবণ! ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইহলোকে শান্তি ও পরলোকে পরাশান্তি লাভ সুনিশ্চিত। গীতার শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান গীতা-মাহাত্ম্যে নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যথা ;—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদং।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥

হে অর্জ্জুন, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারাৎসার, গীতাই আমার নিত্য ও জলন্ত জ্ঞান, গীতাই আমার উত্তম স্থান, গীতাই আমার পরম পদ, গীতাই আমার পরম গোপনীয়, গীতাই আমার পরম গুরু স্থানীয়।

সাকার ও নিরাকার।

এই জগতের সকল প্রকার ভগবৎ উপাসনাকেই দুইটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) সাকার (২) নিরাকার। প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্তের দৃষ্টিতে সাকার বা নিরাকার উপাসনায় কোন প্রভেদ নাই; দুইটী ভাবই সত্য। যাহারা অজ্ঞানী তাহারাই নিরাকার ভাবকে নিন্দা করিয়া সাকার ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, কিম্বা সাকার ভাবকে নিন্দা করিয়া নিরাকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত, উভয়েরই দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন "ভগবান সাকার, নিরাকার, আরও কত কি কেহই তাহা বলিতে পারেনা"।

প্রথমতঃ সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই যেসকল প্রাকৃতিক কার্য্য চলিতেছে তাহার অন্তরালে কোন না কোন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি জল প্রভৃতি সকলের অভ্যন্তরেই সূক্ষ্ম শক্তি ক্রিয়াশীল, প্রত্যেক রোগের

মূলে তৎ তৎ সূক্ষ্ম শক্তি বিদ্যমান! গ্রহ নক্ষত্রাদিও সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হয়। এই সকল সূক্ষ্ম শক্তির সমষ্টিই মহাশক্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।* আর্য্য ঋষিগণ কঠোর সাধনা দ্বারা, ধ্যানযোগে এইসকল সূক্ষ্ম শক্তি ও মহাশক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। এই সকল সূক্ষ্ম শক্তিই হিন্দুর "তেত্রিশ কোটী দেবতা!" আর মহাশক্তিই আদ্যাশক্তি মহাকালী বা মহামায়া ভগবতী দুর্গা!

অসুরগণের অত্যাচারে দেবলোক হইতে তাড়িত হইয়া দেবতাগণ এবিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সভা করিলেন, দৈত্যদিগের অত্যাচার আলোচনায় সকল দেবতাদিগেরই অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তৎপর ব্রহ্মার দেহ হইতে ব্রহ্মতেজ, বিষ্ণু ও শিবের দেহ হইতে তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি বা তেজ, জ্যোতিরূপে নির্গত হইতে লাগিল; এইরূপে সমস্ত দেবগণের শক্তিই জ্যোতিরূপে নির্গত হইল। তৎপর সমস্ত জ্যোতিরাশি মিলিত হইয়া নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, অতঃপর এই জ্যোতিঃমণ্ডলের মধ্যে মহাশক্তি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া দেবতাগণকে অভয় প্রদান করিলেন। দেবীর জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত! কিরীট গগনস্পর্শী, ভুজ-সহস্রে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন! দেবীর এবম্বিধা অপূর্ব্বমূর্ত্তি সন্দর্শনে দেবতাগণ

---

* হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন—"There is an Infinite and Eternal Energy from which every thing proceeds" অর্থাৎ একটী অনন্ত ও অবিনশ্বর শক্তি বিদ্যমান আছে, যাহা দ্বারা সমস্তই পরিচালিত হয়।

অন্য একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—"No one can look unto that sky without feeling that it has been put in order by an Inteligent being" অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্বতঃই প্রত্যেকের অনুভব হয় যে, ইহা কোন "বুদ্ধিমান সত্বা" দ্বারা সুসজ্জিত ও পরিচালিত হইয়াছে।

আনন্দে আত্মহারা হইয়া, আপন আপন অস্ত্রাদি দেবীকে প্রদান করিলেন। সমস্ত শক্তির সমষ্টিভূতা এই মহাশক্তিই ভগবতী দুর্গারূপে ভারতের সর্ব্বত্র পূজিতা হইতেছেন! এই অপূর্ব্বমূর্ত্তিতে, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, সিদ্ধি, বিজয় প্রভৃতি সমস্ত ভাবের একাধারে সমাবেশ রহিয়াছে! তাই মায়ের এই সমষ্টি মূর্ত্তি দর্শনে সাধক গাহিয়াছেন ;—

বিঘ্ন বিনাশন শোভে গণপতি, শুদ্ধজ্ঞানময় সর্ব্বসিদ্ধিপতি,
শিখি আরোহনে বিজয়মূরতি, রাজে কার্ত্তিকেয় শরধনুধারী .
দক্ষিণেতে লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যরূপিনী, শোভে কমলাক্ষ-বক্ষবিহারিনী,
বামে বীণাপানি রজত বরণী, শুদ্ধ সত্বময়ী জ্ঞানপ্রদায়িনী।
ঊর্দ্ধে চিত্রপটে রাজে পশুপতি, তেত্রিংশৎ কোটি দেবের সংহতি,
মা আসিলে আসে সর্ব্ব দেবতাদি, নমি মহাশক্তি বিশ্বরূপিনী!"

আর্য্যঋষিগণ এই সকল দেবতার সূক্ষ্ম তত্ত্বময়ী মূর্ত্তি ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন। আপনাদের তপস্যার প্রভাবে, প্রত্যেক দেবতার রূপের ধ্যান লিপিবদ্ধ করতঃ সেই সেই দেবতার যাবতীয় তত্ত্ব বীজরূপে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এই বীজগুলিই মূলমন্ত্র। যেমন অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ যদিও দেখিতে একটী ক্ষুদ্র সর্ষপ-দানার মত, তথাপি একটী পূর্ণ বৃক্ষের সমস্ত উপকরণাদিই (অর্থাৎ সুবৃহৎকাণ্ড, ডাল, পত্র, ফুল ফল ইত্যাদি) কারণরূপে সূক্ষ্মভাবে ঐ ক্ষুদ্র বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ প্রত্যেক দেবতার বীজমন্ত্রেও সেই সেই দেবতার রূপ এবং যাবতীয় তত্ত্বাদি, কারণ বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। অশ্বত্থ-বীজ উপযুক্ত ভূমিতে পতিত হইলে যেমন উহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ দেবতার বীজমন্ত্রও উপযুক্ত হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে, উহাও চৈতন্য হইয়া ভাবোদ্গম হইতে থাকে ক্রমে সেই সেই দেবতার যাবতীয় তত্ত্বাদি পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া ভক্তের হৃদয়ভূমি আলোকিত করতঃ পরমানন্দ প্রদান করে।

এইরূপে আর্য্যঋষিগণ তত্ত্বমূলক বা ভাবমূলক বহু সাকার দেবমূর্ত্তিব আদর্শ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎব্যতীত যুগে যুগে ভগবান অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াও বহু সাকার মূর্ত্তির আদর্শ ভক্তগণকে প্রদান করিয়াছেন!

এই সকল সাকার মূর্ত্তি ছাড়া, আরও এক শ্রেণীর সাকার মূর্ত্তি দেখা যায়, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে ভক্তের মনোময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাহার বাসনা পূরণ করিয়া থাকেন! যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাব ক্ষে এইরূপ একটা রূপ পরিগ্রহ করা, অসম্ভব বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন! অতুল ঐশ্বর্য্যশালী প্রতাপান্বিত মহারাজাও আপন শিশু পুত্রের আবদার রক্ষার্থে ঘোড়া সাজিতে বাধ্য হন! সুতরাং ভক্তের ভক্তিতে ভগবানও যে তাহার মনোময় মূর্ত্তি ধারণ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

তাই মাতৃভক্ত সাধক গাহিয়াছেন ;—

"যেখানে যেভাবে আছ মা, রওনা তোমার ইচ্ছামত,
চাইনা তেমন ভাবে মাগো, আমি চাই যে মায়েব মত!"

সাগরের জলে হিম লাগিলে যেমন কোন কোন স্থানে বরফ হইয়া যায়, সেই বরফ এবং জল যেমন উপাদান গত এক, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ভগবান নিরাকার হইয়াও ভক্তের ভক্তিহিমে সাকার মূর্ত্তি ধারণ করেন!—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন!

এক্ষণে নিরাকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নিরাকার অর্থ নির্দ্দিষ্ট আকার শূন্যতা; অর্থাৎ ভগবানকে কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত করা যায় না; কারণ তিনি অনন্ত, অসীম, অব্যক্ত, অবাঙ্-মনসোগোচর, একমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত। কেহ কেহ নিরাকার অর্থে "আকারের সম্পূর্ণ অভাব" এরূপ অর্থ করেন, কিন্তু এরূপ অর্থ করা

সমীচিন নহে ; কেননা তাহাতে প্রচ্ছন্নরূপে "শূন্যবাদ" প্রতিষ্ঠা হয়! কিন্তু ভগবান শঙ্করাচার্য্য "শূন্যবাদ" এককথাতেই খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "শূন্যবাদীগণ বলেন যে, একমাত্র শূন্যই আছে, সমস্তই সেই শূন্যে লীন হইবে! 'শূন্য আছে', এই কথা দ্বারা একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল, সুতরাং যাহা আছে, তাহাকে কিরূপে শূন্য বলা যায়? অতএব শূন্যবাদ খণ্ডিত হইল।" * সুতরাং নিরাকার অর্থ সম্পূর্ণ আকার শূন্য এরূপ বলা যায় না; কারণ নিরাকারবাদীরাও ভগবানের একটা কিছু সত্তা স্বীকার ও বিশ্বাস করেন; কিন্তু যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, তাহা নিরাকার হয় কিরূপে? অতএব নিরাকারবাদীগণের ভগবানেরও একটা কিছু সত্তা বা আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই আকার বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, মনবুদ্ধি দ্বারাও ধারণা করা যায় না, উহা গুণাতীত, ভাবাতীত, বিন্দুনাদ কলাতীত!—তাই নিরাকার!

ভগবানের সাকার ও নিরাকার মূর্ত্তিতে মূলতঃ কিছুই প্রভেদ নাই! আপন আপন ইচ্ছামত যে কোন অলঙ্কার সুবর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করাইলেও উহাতে সুবর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ উহা সুবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে! জলে ডুবিয়া থাকিয়া জল খাইলে যেমন পিপাসা দূর হইয়া

---

* বৌদ্ধগণ কারণ জগতে লয়ের অবস্থাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন উহা জ্ঞানেরই একটা স্তর মাত্র। এই স্তর অতিক্রম করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক জগত ফুটিয়া উঠিবে; কিন্তু বৌদ্ধগণ সেই স্তরে উঠিতে পারেন নাই। বৌদ্ধমত প্রকারান্তরে জ্ঞানেরই সাধনা, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, তাহাতে অধিকারভেদ নাই। স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, ভক্ত জ্ঞানী, সকলেরই একই মত এবং একই পথ। যাহারা ভক্তির নিম্নস্তরের অধিকারগুলিও আয়ত্ত করিতে পারে নাই তাহাদিগকে জ্ঞানের উচ্চতম স্তরের অবস্থা গ্রহণ করিতে দিলে তাহারা কি বুঝিবে, আর কি লাভ করিবে? অধিকারভেদ না থাকাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনের মূল কারণ। লেখক।

শান্তি হয়, সেইরূপ 'টি বাটীতে জল তুলিয়া জল পান করিলেও তৃষ্ণা দূর নিশ্চয়ই হইবে! কারণ জলপান করাই সকলের উদ্দেশ্য। সেইরূপ ভগবানকে নিরাকার বা অনন্তরূপেই হউক, কিম্বা যে কোন সাকার আকারে আকারিত করিয়াই হউক, একবার তাঁহাকে আস্বাদন করিতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হইবে!—সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনন্তত্বে ডুবিয়া জ্ঞানীর যে আনন্দ, সচ্চিদানন্দ ভগবানের বিগ্রহ লইয়া ভক্তেরও সেই আনন্দ; কারণ ভগবান সচ্চিদানন্দময়! সকলেরই উদ্দেশ্য সচ্চিদানন্দ লাভ!!

সাকার ও নিরাকার উপাসনা সাধনার দুইটী পর পর স্তর মাত্র; সাকার নীচের স্তর নিরাকার উপরের স্তর। নিরাকারের স্তরে যাইতে হইলে সাকারের মধ্যদিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; কেননা উহাই নিম্নের স্তর। গাছে চড়িতে হইলে গোড়া আশ্রয় ব্যতিত হঠাৎ অগ্রভাগে উঠা যায় না! তবে যাহারা অধিকারী হইয়া নিরাকার স্তরে উঠিতে পারিয়াছেন, তাহাদের কথা পৃথক্। ভগবানের সগুণ অবস্থাতে সাকার এবং নিরাকার দুই অবস্থাই বিদ্যমান আছে, কিন্তু নির্গুণ অবস্থা কেবল নিরাকার! দৃশ্যমান জগতটা ভগবানের সাকার মূর্ত্তি, আর জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে বিরাজিত চৈতন্য-সত্তা নিরাকার! জীবদেহমাত্রই সাকার, আর তাহাদের দেহী বা আত্মা নিরাকার! সেইরূপ আমাদের দেহটা সাকার, আর আমাদের আমিত্ব (আত্মা) নিরাকার! অর্থাৎ এককথায় গুণময়ী প্রকৃতিই সাকার, আর গুণাতীত পুরুষ নিরাকার। তাই মহাত্মা কবির বলিয়াছেন ;—

"নির্গুণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহ্‌তারী।
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী॥

অর্থাৎ আমার পিতা হচ্চেন নির্গুণ, আর মাতা সগুণ, এখন কাকেই বা নিন্দা করি, আর কাকেই বা বন্দনা করি, দুইজনই সমান!

সাকারে আর নিরাকারে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ নাই; অধিকারী ভেদে সাধনার জন্যই ঐ প্রকার স্তরের বিভাগ। বিশেষতঃ এই জগতে গুণময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলায় লিপ্ত থাকিয়া, অনেককেই সদাসর্ব্বদা সাকারভাব ও সাকার চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এরূপ অবস্থায় তাহাদের পক্ষে নিরাকারভাব গ্রহণ বা ধারণা করা সাধ্যায়ত্ব নহে! তবে যাহারা সংসার-সাধনে, অনাসক্ত ও গুণাতীত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, জ্ঞানের উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিরাকার উপাসনা করিতে পারেন; এতৎব্যতিত সর্ব্বসাধারণের প ভগবানের কোন একটী সাকার ভাব অবলম্বন করতঃ সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য! ইহাদ্বারাও সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়া পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ হইবে!!

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।

সাকার নিরাকারের ন্যায় ভগবানের আরও দুইটী ভাব বিদ্যমান আছে, যথা (১) ঐশ্বর্য্য (২) মাধুর্য্য! ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, তিনি চিন্তাতীত, ভাবাতীত, নিরাকার, অনন্ত, এইপ্রকার মহিম-জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করার নাম ঐশ্বর্য্যভাব। আর ভগবান আনন্দময়, করুণাময়, প্রেমময় আপনা হইতেও আপনার জন, এই প্রকারে আপনভাবে তাঁহাকে লাভ করার উপাসনার নাম মাধুর্য্যভাব। ঐশ্বর্য্য ভগবানের বহিরঙ্গ ভাব, আর মাধুর্য্য ভগবানের অন্তরঙ্গ ভাব! এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিলে ভাবটী বেশ বুঝা যাইবে।

জনৈক একচ্ছত্র সম্রাট সুসজ্জিত বেশে রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন,

তাঁহার সঙ্গে দেহরক্ষক সৈন্যগণ ভীম মূর্ত্তিতে বিরাজমান! পাত্র-মিত্র সভাসদগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিবাদন করিতে লাগিলেন, সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ আর কটিতে তরবারী ঝল্‌মল করিতে লাগিল। অপরাধীগণ কম্পিত কলেবরে বিচারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল, সম্রাট বিচারাদি শেষ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করিলেন। তৎপর রাজকার্য্য সমাধা করিয়া গাত্রোত্থান করিলে দেহ-রক্ষীগণ বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিল, সম্রাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, তাহারা ফিরিয়া আপন বাসস্থানে চলিয়া গেল।

এদিকে সম্রাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করা মাত্রই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁহার হাতে আসিয়া ধরিল, কোলে কাঁধে চড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল! রাজবেশ পরিত্যাগ করার সময়টুকু পর্য্যন্ত তাহাদের যেন সহ্য হয় না! অতঃপর কোন মতে সম্রাট রাজবেশ ত্যাগ করিলে, ছেলেমেয়েরা ধূলামাটী লইয়াই কোলে কাঁধে চড়িতে লাগিল। সাম্রাজ্ঞীও বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে বলিয়া, দুচারটী শক্ত কথাও শুনাইয়া দিলেন। তৎপর স্নানাহারান্তে বিশ্রাম করতঃ সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবটী বেশ বুঝা যাইবে। সম্রাটের রাজদরবারের ব্যবহার ও রাজবেশ ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যভাব, আর অন্তঃপুরের ভাবটী মাধুর্য্যভাব!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইয়া ঐশ্বর্য্য ভাবের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, আর বৃন্দাবন লীলাতে সখ্য বাৎসল্যাদি পঞ্চভাবের বিকাশ করিয়া, মাধুর্য্য রসের চরম আদর্শ স্থাপনা করিয়াছিলেন। *

---

* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম্মকে শাসন করতঃ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন দ্বারা "সৎ ভাব." যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি ভক্তগণকে উপদেশচ্ছলে জ্ঞানের চরমতত্ত্ব বিকাশ করিয়া "চিৎ ভাব" এবং

পঞ্চভাব ও সাধনা।

ঈশ্বরত্ব লাভের অন্যতম উপায় পঞ্চভাবের সাধনা! পঞ্চভাব কি? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী সাধনাকে পঞ্চভাবের সাধনা বলা হইয়া থাকে। এই পাঁচটী ভাব পর পর সিঁড়ির ন্যায়। পঞ্চভূত যেমন একটী অপরটীতে লয় হইয়া ক্রমে আকাশে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ শান্ত দাস্যে পর্য্যবসিত হয়, দাস্য সখ্যে, সখ্য বাৎসল্যে, বাৎসল্য মধুরভাবে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং দাস্যে শান্ত ভাব আছে; সখ্যে শান্ত দাস্য, বাৎসল্যে শান্ত দাস্য সখ্য এবং মধুরে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চারিটী ভাবই বিদ্যমান আছে, এজন্য একটী ভাব হইতে অন্যটী পর পর শ্রেষ্ঠ; এইজন্য মধুর ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শান্তভাব। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব মহিমা দর্শনে কোন কোন ভক্তের চিত্ত শান্ত হইয়া যায়। তাঁহাদের চিত্তে কোন প্রকার সুখ দুঃখের ভাব কি কোন প্রকার ভেদভাব থাকে না। ভগবানকে একবার দর্শন করিতে পারিলেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হন। ভগবানকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত মনে করেন, তখন কোনপ্রকার প্রার্থনা বা বিশেষভাব তাঁহাদের থাকে না! তাঁহাদের চিত্ত অখণ্ড শান্তি-রসে পরিপূর্ণ হইয়া যায়!—তাহারা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন!—ইহাই শান্তভাব। মুনি ঋষিগণের এই ভাব ছিল। সনক সনাতনাদি ব্রহ্মর্ষিগণ এইভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দাস্যভাব। শান্তভাবে সাধক ভগবানের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ

বৃন্দাবন লীলায় "আনন্দ ভাব" বিকাশ করিয়া একত্রে সচ্চিদানন্দের পরিপূর্ণ প্রকট লীলা দেখাইয়াছেন! অন্যান্য অবতারে এই তিনটী ভাবের একত্র সমাবেশ বা বিকাশ দেখা যায় না; এজন্য কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া থাকেন।

হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইতে ছিল ভগবান অনন্ত, অসীম, চিন্তাতীত ভাবাতীত ইত্যাদি। কিন্তু সেই সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি রতি উৎপন্ন হওয়ায়, ক্রমশঃ মহিম-ভাব দূর হইয়া মনে হইতে লাগিল, ভগবান অনন্ত বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার যে অতি নিকট সম্বন্ধ! তিনি প্রভু আমি দাস, কিম্বা তিনি পিতা আমি তাঁহার সন্তান! সাধকের এবম্বিধ মানসিক অবস্থায় ভগবান হইতে তিনি আর বেশী দূরে নহেন! তখন সাধক আকুল হৃদয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন!—ইহাই দাস্য ভাব। দাস্য ভাবেরও দুইটী স্তর আছে; প্রথম স্তর 'সম্ভ্রম' দ্বিতীয় স্তর 'গৌরব'। প্রথম স্তরে ভক্ত দাস হইয়া প্রভুর ন্যায় সম্ভ্রমের সহিত ভগবানের সেবা করেন। দ্বিতীয় স্তরে ভক্ত পুত্র হইয়া ভগবানকে পিতার ন্যায় সেবা করিয়া গৌরব অনুভব করেন। নারদ, উদ্ধব, অক্রুরাদি ভক্তগণ দাস্যভাবে ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন।

সংসার-আশ্রমে এই দাস্যভাব অবলম্বন করিতে পারিলে জীবন-সংগ্রামের কঠিন সমস্যার অতি সহজ ও সরল মীমাংসা হয়। বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায়, ভগবানের সংসারে সংসারী হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য অনাসক্তভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলে—কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে পারিলে, ইহাদ্বারাই সংসার বন্ধন নষ্ট হইয়া পরাশান্তি লাভ হইবে!—পৃথক্ সাধনার আর প্রয়োজন হইবে না!

সখ্যভাব। দাস্যভাবে ভগবানের প্রতি রতি যতই গাঢ় হইবে, ততই ভক্ত আরও ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে। প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যেও একটা দূরত্ব থাকে, পুত্রও পিতার সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারে না! সুতরাং ভগবানের প্রতি রতি গাঢ় হইলে, এই ভেদ ভাব আর থাকে না! তখন ভক্তের মনে হয়, ভগবান আমার সখা, তিনি আমার বন্ধু, তাঁহার মত বান্ধব আমার আর কেহই নাই। এইরূপে ভগবানের সহিত

ভক্তের ভালবাসা ও মিশামিশি হয়!—ভক্ত ভগবানেতে প্রাণ ঢালিয়া দেয়—ইহাই সখ্যভাব। সখ্যভাবে ভক্ত ভগবানকে কাঁধে করে, কাঁধে চড়ে, উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেও সঙ্কুচিত হয় না! কেননা ভক্তের নিকট যাহা ভাল লাগে তাহাই ভক্ত ভগবানের জন্য রাখিয়া দেয়! ভগবানকে আপনা হইতেও আপনার মনে করে; ইহাই সখ্যভাবের সাধনা। শ্রীদাম সুবলাদি ব্রজরাখালগণ ভগবানকে এই ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাৎসল্য ভাব। সখ্যভাবে ভগবানের সহিত ভক্তের মিশামিশি হওয়ায়, ভালবাসা এতই গাঢ় হয় যে তখন ভগবান ভক্ত অপেক্ষা ছোট হইয়া যান! অর্থাৎ তখন ভক্ত মনে করেন আমি না খাওয়াইলে কে তাহাকে খাওয়াইবে? আমি দেখা শুনা না করিলে কে তাহাকে দেখিবে শুনিবে? এই প্রকারে ভক্তের নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব উদয় হয়!—ইহাই বাৎসল্য ভাব। সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাসার মত এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর দেখা যায় না! এই ভালবাসা কোনপ্রকার প্রতিদানের অপেক্ষা করে না, নিঃস্বার্থ ও অযাচিতভাবে পিতামাতা সন্তানের উপর ভালবাসা ঢালিয়া দেন!—সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন! ভগবানের প্রতি ভক্তেরও যখন এই প্রকার ভালবাসার উদয় হয়, তখন ভক্ত ভগবানের দর্শনে পরমানন্দ ও অদর্শনে জগৎ শূন্যময় দেখেন! ইহাকেই বাৎসল্য ভাবের সাধনা বলা হইয়া থাকে। নন্দ যশোদা মেনকা প্রভৃতি বাৎসল্যভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইভাবের সাধনাবস্থায় ভগবানের মহিম-জ্ঞান একেবারেই থাকেনা। কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যের ভাব দর্শন করিলে, ভক্ত ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভীত হন! শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও যশোদা ইহাতে ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্কাই করিয়াছিলেন!

মধুর ভাব। বাৎসল্যভাবে ভক্ত ভগবানের জন্য সর্ব্বদা তন্ময় ভাবে চিন্তা করেন, অদর্শনে তাঁহার ধ্যানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন, এইরূপে তাঁহার প্রতি রতি গাঢ়তম হইয়া প্রেমে পরিণত হয়; তখন ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন! —আত্মচিন্তার আর অবসর থাকে না, কান্তের চিন্তাতেই সর্ব্বচিন্তা পর্য্যবসিত হয়! সেই অবস্থায় ভক্ত ভগবান নাই, ধ্যেয় ধাতা ধ্যান নাই। —সমস্তই একত্বে বিলীন!—ভক্ত ভগবানে আত্মবলি দিয়া আত্মহারা হইয়া যান! তাঁহার অন্তর বাহির ভগবানে পরিপূর্ণ হয়, সর্ব্বত্রই ভগবৎ দর্শন হইতে থাকে!—ইহাই "মধুর ভাব" বা "মধুর প্রেম"। মধুর ভাবে পাঁচটি ভাবই বিদ্যমান থাকে, মধুর ভাবের ভক্ত শান্ত ও দাস্যভাবে একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানের সেবা করেন, সখ্যভাবে প্রমোদ, বাৎসল্যভাবে যথাযোগ্য ভোজ্যদ্বারা তৃপ্তি ও মধুর ভাবে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন। এজন্য মধুরভাব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মধুর!

কেহ কেহ স্বামীস্ত্রীর ভালবাসাকে মধুরভাব বলেন, কিন্তু সাধারণতঃ ঐ ভাব সখ্যভাব, কেননা স্বামীও স্ত্রীর নিকট কিছু প্রতিদান আশা করেন, আবার স্ত্রীও স্বামীর নিকট কিছু না কিছু প্রতিদান অভিলাষী; সুতরাং এই প্রকার বিনিময় ভাবের ভালবাসাকে সখ্যভাব বলা যাইতে পারে। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া ভালবাসে, স্বার্থ-সম্পর্ক শূন্য হইয়া, ভালবাসার জন্যই যদি তাহাকে ভালবাসে, স্বামীর বিরুদ্ধ ব্যবহারেও যদি তাহার কোনপ্রকার প্রেমভাবের হ্রাস না হয়, তবে এই প্রকার ভালবাসা মধুর ভাবে কতকটা পরিণত হইতে পারে! কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে প্রাকৃত ভালবাসা কখনও অপ্রাকৃত ভগবৎ প্রেমের সহিত তুলিত হইতে পারেনা!

শান্তভাবে কতকটা মহিম-জ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, কাহারও মতে উহা ঐশ্বর্য্য ভাবের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও, দাস্যাদি চারিটীভাব মাধুর্য্য

...বের অন্তর্গত, ইহাতে কাহারও মত বিরোধ দৃষ্ট হয় না। আবার ...হারও মতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চারিটী ভাব দ্বৈত আর মধুরভাব ...দ্বৈতভাব, কেননা মধুরভাবদ্বারা ভক্তও ভগবান হইয়া যায়।*

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতি রাধিকা এইপ্রকার প্রেমভাবে বা মধুরভাবে ...বানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন্য রাধাভাব "সাধ্য শিরোমণি" অর্থাৎ ...নার চরম অবস্থা বলিয়া ভক্তগণ উল্লেখ করিয়াছেন!

আপনাকে দীনহীন এবং ভগবানকে বিরাট, অনন্ত, এরূপ মনে করিলে, ...হার সহিত প্রেম হইবে না! যখন ভক্তের মনে হইবে, আমি জ্ঞান চাইনা, ...ক্তি চাইনা, মুক্তি চাইনা, কিছুই চাইনা!—চাই শুধু তোমাকে!—তুমিই ...মার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তোমাকে ...য়ে ধরিলেই আমার শান্তি, আমার পরমানন্দ! ভগবানের সহিত ভক্তের ...ই প্রকার একাত্মভাবের নাম প্রেম!! প্রেম একবার অঙ্কুরিত হইলে ...দাস্য থাকেনা, বিধি নিষেধ থাকেনা, কুলমান থাকেনা, ভালমন্দ, সুখ দুঃখ, ...ছুই থাকেনা! থাকে শুধু, আত্মহারা পাগলপারা তন্ময়ভাব। প্রেমের

রাস পূর্ণিমার অপূর্ব্ব নিশিথিনীতে রাস-রসেশ্বর রসিক-শেখর নটবর শ্রীকৃষ্ণ, ... প্রেমোন্মাদিনী ব্রজগোপীগণকে প্রেমের পূর্ণত্ব আস্বাদন করাইবার জন্য, হঠাৎ ...দ্ধান হইলে, গোপীগণের কি প্রকার মহাভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা সকলেই ...ত আছেন। গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছিলেন, "আমিই কৃষ্ণ, দেখ ...নি কিরূপ মনোহর রূপে গমন করিতেছি, তোমরা ভীত হইওনা, আমি ...মাদিগকে রক্ষা করিব", এই বলিয়া আপন উত্তরীয় বসন ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া ...র্দ্ধন ধারণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কেহবা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা অনুকরণ ...য় হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন, কেহবা গোচারণের অনুকরণ করিয়া ধেনুগণকে ... বাদন করতঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন দুই গোপী কৃষ্ণ ও বলরাম ... দাঁড়াইলেন! আবার কোন দুই গোপী কৃষ্ণ ও রাধা হইয়া বাঁশরী বাজাইতে ...লেন।—গোপীগণ আর কৃষ্ণ বিরহিনী নহেন।—তাঁহারা স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন।।

এইপ্রকার অবস্থায় প্রেমিকভক্ত তপনে ভগবানের জ্যোতি, চন্দ্রে তাঁহার লাবণ্য, কুসুমে তাঁহার হাসি দর্শন করিতে থাকেন! বিহ কুজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, তাঁহার প্রেমগীতি শ্রবণ করিয়া পুলকিত হন হৃদয়ে নব নব ভাবের উন্মেষ হইয়া প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমান মাতাইয়া তুলে! তখন ভক্ত প্রেমাস্পদকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দ করিতে থাকেন!—সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববস্তুতে প্রেমাস্পদের প্রেমময় মূর্ত্তি স্ফূ পাইতে থাকে! এই প্রকারে রাধাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রেমিক প্রেমি সচ্চিদানন্দ সাগরে চিরতরে বিলীন হন!—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহা-রাস মিলিত হইয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন!!

এক্ষণে জ্ঞানীগণ যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, শৈবগণ যাহাকে শিব বলি উপাসনা করেন, বৌদ্ধগণ যাহাকে বুদ্ধ বলেন, জৈনগণ যাহাকে অ বলিয়া থাকেন, নৈয়ায়িকগণ যাহাকে কর্ত্তা বলেন এবং মীমাংসক যাহাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকেন, বাঞ্ছাকল্পতরু পরমদয়াল আনন্দ-ক সেই শ্রীহরির পদদ্বন্দারবিন্দ স্মরণ করতঃ এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলা

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসন রতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোহয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ

—(০)—

ওঁ মহাশান্তি ওম্!!

—(০)—

হরি ওঁ তৎসৎ।

সনাতন-ধর্ম্মে মানব-জীবন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মত্ব।

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মত্ব লাভ। ব্রহ্মত্ব বুঝিতে হইলে, ব্রহ্মত্ব কি? ব্রহ্মত্বলাভের উদ্দেশ্য কি? ইহাতে জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা, এই সকল বিষয় বিচার ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থাই ব্রহ্মত্ব! এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক জীবই সুখের কাঙ্গাল! প্রত্যেকে সুখের আশাতেই ইতঃস্তত ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে! জীব পূর্ণব্রহ্মেরই অংশ, একদিন সে পূর্ণানন্দ আস্বাদন করিয়াছে, সেই অনুভূতিই জীবেতে সংস্কাররূপে বিরাজ করিতেছে, তাই ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দ লইয়া জীব পরিতৃপ্ত হইতেছে না, পূর্ণানন্দের আশায় জীব উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেবল ছুটিতেছে!—শান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, তৃপ্তি নাই, কেবল ছুটাছুটি! আবার অজ্ঞানতা নিবন্ধন জীব প্রকৃত আনন্দের বস্তু পরিত্যাগ করতঃ অনিত্য ও নিরানন্দ পরিপূর্ণ বিষয়কেই আনন্দ মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে! অনিত্য বস্তুতেই নিত্যসুখ অনুসন্ধান করিয়া ভ্রান্ত ও প্রতারিত হইতেছে! কিছুতেই অভাব মিটিতেছে না, কিম্বা শান্তি হইতেছে না! এই অজ্ঞানতার মোহ দূর না করা পর্য্যন্ত জীবের ভ্রান্তিনাশ কিম্বা স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইতে পারে না! সুতরাং নিরানন্দ

ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া, স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দলাভ করাই জীবের উদ্দে
ও কর্ত্তব্য !—এই স্বরূপ জ্ঞানই "ব্রহ্মজ্ঞান" এবং স্বরূপ আনন্দই "ব্রহ্মানন্দ'
আর এতদুভয়ের মিলনই "ব্রহ্মত্ব" !!

এই ব্রহ্মত্বের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। ইহাকে বাক্য দ্বারা কেহ প্রকা
করিতে পারেনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "বেদবেদান্তা
সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট, কেননা সমস্তই মুখদ্বারা প্রকাশিত বা উচ্চারি
হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মত্বই অনুচ্ছিষ্ট কারণ ইহাকে কেহ বাক্যদ্বা
প্রকাশ করিতে পারে না"। শাস্ত্রেও আছে যথা—

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রানি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মনোজ্ঞান মব্যক্তং চেতনাময়ং॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

সকল শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং সকল বিদ্যাই মুখে মুখে রহিয়াছে
কিন্তু সেই অব্যক্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মজ্ঞান অদ্যাপি উচ্ছিষ্ট হয় নাই।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।"

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

মন ও বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ তিনি অবা
মনসোগোচর !

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুংশক্যো ন চক্ষুষা।"

কঠোপনিষৎ

সেই পরব্রহ্মকে বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা কিম্বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত
হওয়া যায় না।

ভরদ্বাজ মুনি ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম কি?"—তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "অচিন্ত্যোপাধি বিনিমুক্তং অনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্ম।"—(নিরালম্বোপনিষৎ) অর্থাৎ অচিন্ত্য, উপাধি মুক্ত, আদি অন্ত রহিত, শুদ্ধ, শান্ত, নির্গুণ, নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, অখণ্ড, একরস, অদ্বিতীয় চৈতন্যই ব্রহ্ম।

জগত ব্রহ্মময়। ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ জগতকে বুঝিতে হইবে। কেননা ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও স্বেচ্ছায় একাংশে জীবজগতরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে জানিতে হইলে জগততত্ত্ব জানিতেই হইবে. ভগবানের বিশ্বময় বিশ্বরূপই জগত-রূপ। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন, আমার বিভিন্ন বিভূতির বিষয় জানিবার আর প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারাই এই বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।"* শ্রুতিতেও আছে যথা,—

"পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

সমস্ত ভূতগণ তাঁহার একপাদ, আর ত্রিপাদ অমৃত! অর্থাৎ একপাদে পরিবর্ত্তনশীল জীবজগত, আর তিনপাদ নিত্য ও অমৃতময়।

সকল শাস্ত্রকারগণই বলিয়া থাকেন, এই পরিদৃশ্যমান জগত ব্রহ্মময়। "ব্রহ্মই সত্য আর জগত মিথ্যা" অর্থাৎ এই জগতকে ব্রহ্মময় দর্শন না করিয়া যে জগতরূপে, ভেদভাবে দর্শন করা হইতেছে, এই ভেদভাব মিথ্যা! যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কাচেতে জলভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেতেই জগতভ্রম হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন, অতঃপর জীবজগতাদি বহুরূপে প্রকাশিত

* গীতা ১০ম অধ্যায় ৪২ শ্লোক।

হইলেন ; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জীবজগত, চরাচর, জড়অজড়, সমস্তই ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে ! তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বখল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম ; তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তাঁহাদ্বারাই স্থিতি এবং তাঁহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়।

যেমন বস্ত্র হইতে সূত্র পৃথক্ করিলে, বস্ত্র বলিয়া কিছুই থাকেনা, সেইরূপ জগত হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ করিলেও জগত বলিয়া কিছুই থাকেনা ! সূত্র যেমন বস্ত্রের কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের কারণ ; যদিও জগতছাড়াও ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু ব্রহ্মছাড়া জগত নাই ! মন অদ্বিতীয় হইলেও যেমন স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই মায়া-শক্তির প্রভাবে জীবজগতাদি পৃথক পৃথক্রূপে কল্পিত হইতেছে ! শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ।"

অর্থাৎ এই বিশ্ব, জগত, সর্ব্বভূত ভগবান বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করা যাউক, সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভগবান "ব্যাপক" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, আর "একমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।* এই ব্যাপকত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটী বিচার করিলে দেখা যায় যে, এমন কোন স্থান নাই যেখানে ভগবানের অভাব ! অর্থাৎ জীবজগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি বিরাজিত আছেন। "তিনি অণুঅণীয়ান্, আবার গুরুগরীয়ান্!" অর্থাৎ তাঁহার

* একেশ্বর বাদ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মত ছোটও কেহ নাই, আবার তাঁহার মত সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠও কেহ নাই! এক কথায় তিনি সকলের ভিতরে অণুপ্রবিষ্ট, আবার তাঁহার বিরাট দেহের মধ্যেই সমস্ত জীবজগতাদি অবগাহিত রহিয়াছে! তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"যেদিকে তাকাই সেই বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর,
প্রেমের নয়নে হের নিরন্তর পূজ, প্রেমফুলে দিয়ে অশ্রুজল;
কোথা ভেদাভেদ দেখনা চাহিয়ে, তুমি আমি সব তাঁহাতে ডুবিয়ে,
ভাব সেই একে আমিত্ব নাশিয়ে, বিশ্বপ্রেমে হোক জীবন সফল!"

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে শূলবিদ্ধ করিয়া, সাগ[illegible] নিক্ষেপ করিয়া, পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দিয়া, অগ্নিতে দাহ করিয়া, হস্তীর পদতলে পেষণ করিয়াও কিছুতেই বিনাশ করিতে না পারায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন; তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তোর হরি কোথায় আছে?" প্রেমিক ভক্ত বলিলেন, "আমার হরি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই আছেন।" দৈত্যরাজ বলিলেন, "এই স্তম্ভের ভিতরেও কি তোর হরি আছে?" ভক্তরাজ বলিলেন, "হাঁ এই স্তম্ভের মধ্যেও আমার হরি আছেন।" তখন গর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে স্ফটিক স্তম্ভ বিদারণ করিলে, অমনি তাহা হইতে ভীষণ নৃসিংহ মূর্ত্তি বাহির হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন! এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাটী বিচার করিলে দুইটা ভাব পাওয়া যায়; প্রথম ভাবটী এই যে, ভক্তকে ভগবান সর্ব্বদাই রক্ষা করেন এবং প্রয়োজন হইলে ভক্তের জন্য ভগবান প্রকট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন! দ্বিতীয় ভাবটী এই যে, ভগবান সর্ব্বত্রই ব্যাপক রূপে বিরাজিত আছেন, ভক্তির একাগ্রতা হইলেই যে কোন আধারে তিনি প্রকটিত হইতে পারেন! গীতাতেও ভগবান ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যথা,—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি॥

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু এবং সকল বস্তুতেই আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হইনা সেও আমার নিকট অদৃশ্য হয় না।

"সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

গীতা।

সর্ব্বত্র সমদর্শী, সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সকলভূতে আপনাকে (আত্মাকে) এবং আপনাতে (আত্মাতে) সকল ভূত নিহিত দেখিতে পান।

মার্কণ্ডেয়ঋষি মহারাজা সুরথকে বলিয়াছিলেন,—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

সেই দেবী নিত্যা, এই জগতই তাঁহার মূর্ত্তি, তিনিই চিন্ময়ীরূপে সমদম জগত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

দেবতাগণ দেবীর স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কাতে স্তুতি স্তবপরা পরোক্তিঃ।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

হে মাতঃ, তুমিই একাকী সমস্ত জগতের ভিতরে বাহিরে মাতৃরূপে পরিপূর্ণ হইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছ, হে স্তবাতীতা, শ্লাঘ্য উক্তিদ্বারা তোমার কি স্তব করা সম্ভব?

দেবী স্বয়ং বলিয়াছিলেন ;—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

এই জগতে আমিই অদ্বিতীয়া, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে ?

মহাদেব বলিয়াছেন ;—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্য আত্মত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এই তিন ভাবের প্রকাশ মায়া সম্ভূত, এই তিনটীর আত্মবিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে।

এই যে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ সমরস এক অখণ্ড সত্ত্বা, যাহার ভিতরে জীব জগত সমস্তই ডুবিয়া রহিয়াছে, যাহাতে তুমি আমি সকলেই মিশিয়া রহিয়াছি, এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় সত্ত্বাই ব্রহ্ম!—ইহাকেই ভক্তগণ বলিয়া থাকেন "সকলই তুমি" আর জ্ঞানীগণ ক্ষুদ্র আমিত্বের অহংঙ্কারও সেই বিরাট সত্ত্বায় বিসর্জ্জন দিয়া বলেন, "আমিও তুমি" —"সোহং" তাই সাধক গাহিয়াছেন ;—

"আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবে কি আর বইলেম আমি,
মিছে করি আমি আমি আমিতো মা আমি নই।"

এই সোহং মুখে প্রকাশ করা যায় না, সাধনার চরম অবস্থায় ইহা ভক্তের * বা জ্ঞানীর উপলব্ধির বস্তু !!

* রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে ব্রজগোপীগণ কিরূপ সোহংভাব লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে।—লেখক।

কবি বলিয়াছেন ;—

"চিন্তায় নাহিক মিলে পরম সে আমি, মায়া পরামর্শশূন্য নিষ্কল সে ভূমা !"

এই সোহং তত্ত্বই প্রেমতত্ত্ব বা মধুর ভাব ! এই তিনটি তত্ত্বই অদ্বৈত ভাবে পরিপূর্ণ। সোহংতত্ত্ব বা প্রেমতত্ত্বের স্বরূপও অনির্ব্বচনীয় ! যথা ;—

"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্। মূকাস্বাদনবৎ ॥"

নারদসূত্র।

প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। উহা বোবার আস্বাদনের ন্যায় ! অর্থাৎ যেমন বোবা উত্তম ভোজ্য আহার করিয়া নিজেই উহার আস্বাদন উপভোগ করে, অপরকে এ বিষয় কিছুই বুঝাইতে পারে না ; সেইরূপ যিনি প্রেম-পিযুষধারা পানে পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন তিনিও এবিষয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন না।

জীব ব্রহ্মে ঐক্যতা। জীবাত্মা, পরমাত্মারই অংশ, জীবভাব দূর হইলেই জীবাত্মাপরমাত্মার মিলন হয়, জীব স্বস্বরূপে অবস্থান করে। একটী গৃহে আবদ্ধ বায়ু যেমন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অখণ্ড বায়ুরাশির সহিত অভেদ, কেবল গৃহরূপ উপাধিদ্বারা উহা মূল অখণ্ড বায়ুরাশি হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তরস্থ সর্ব্বগত আত্মাও নামরূপ ও শরীরাদি উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে ! সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের সহিত মিশিয়া সেই গৃহস্থিত বায়ু "সুগন্ধ বায়ু" বা "দুর্গন্ধ বায়ু" এইরূপ নাম ও গুণ সম্পন্ন হইয়া মূল বায়ুরাশি হইতে আরও পৃথক্ হইয়া পড়ে ; কিন্তু ঐ সুগন্ধ বা দুর্গন্ধাদি গুণকে পরিত্যাগ করিলে যেমন একমাত্র অখণ্ড বায়ুই অবশিষ্ট থাকে ; সেইরূপ নির্ব্বিকার আত্মাও প্রকৃতির সত্ব রজ তম গুণাদির সহিত জড়িত হইয়া জীব অভিমানে স্বরূপ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গুণকে একবার অতিক্রম করিয়া গুণাতীত

হইতে পারিলে, সচ্চিদানন্দ আত্মারূপেই অবস্থান করিবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"জীবো ব্রহ্মাভিন্নঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণাৎ ব্রহ্মবৎ।"

অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, সচ্চিদানন্দ লক্ষণ হেতু জীবও ব্রহ্মের ন্যায়। "আত্মা বহুরূপিনী মায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া বহুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হন এবং দেহাদিতে "আমি," "আমার" বলিয়া অভিমান করেন, আর যখন তিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন তখনই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন!" *

নদী যেমন সাগর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, সাগর ভাবই অবলম্বন করে, সেইরূপ ভক্ত অথবা জ্ঞানী অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবানে বা ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব লাভ করেন। জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, কোটী কোটী শাস্ত্র গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার সারভাগ অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা প্রকাশিত করা যায়, তাহা এই :—"ব্রহ্মই সত্য এবং জগত মিথ্যা, আর জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহই নহে!" যথা—

"ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হনুমান তুমি কে?" ভক্তরাজ হনুমান উত্তর করিয়াছিলেন,—

"দেহ দৃষ্ট্যাহি দাসোঽহং, জীববুদ্ধ্যা তদংশকঃ।
বস্তুতস্তু তদেবাহং ইতিমে নিশ্চিতামতিঃ॥"

যখন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয় তুমি প্রভু আমি তোমার দাস! যখন জীব বুদ্ধি হয়, তখন মনে হয়, তুমি পরমাত্মা আর আমি তোমারই অংশ, কিন্তু প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করিলে মনে হয়,

* শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২।৩ শ্লোক

তুমিও যেমন আমিও তেমন, অর্থাৎ তুমি আমি অভেদ! আমার এইপ্রকার নিশ্চয় ধারণা হয়।

জ্ঞানী ও ভক্তের ঐক্যতা। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের লক্ষ্যই ব্রহ্মানন্দ লাভ; কেননা ভক্ত চান ভগবানকে লাভ করিতে—ভগবান ব্রহ্মময়! সমস্ত রসের আকর, সর্ব্ববিধ আনন্দ তাহা হইতেই উৎসারিত! সুতরাং ভক্তেরও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ব্রহ্মানন্দই লক্ষ্য। আর জ্ঞানীরতো ব্রহ্মানন্দই চরম লক্ষ্য। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মশাস্ত্রই আনন্দ লাভ কিসে হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, দর্শন-শাস্ত্রগুলিরও লক্ষ্য আনন্দ লাভ। প্রথমতঃ চার্ব্বাক দর্শনকার অতিস্থূল ভাবের সুখ লক্ষ্য করিয়া বিচার করিয়াছেন; তৎপর জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই উচ্চতর সুখ বা আনন্দ লক্ষ্য হইয়াছে। এইরূপে সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক ন্যায় মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়বিধ দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রগুলিও তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দুঃখ নাশ এবং আনন্দ লাভেরই উপায়ই নিরূপণ করিয়াছেন; পরিশেষে বেদান্ত দর্শন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, "আদৌ দুঃখ নাই! তুমিই আনন্দ স্বরূপ! জীবই ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্মময়! সুতরাং বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুঃখের চির-নিবৃত্তি করতঃ ব্রহ্মানন্দ লাভই সকলের লক্ষ্য! ভগবান বেদব্যাস একদিকে যেমন "বেদান্ত দর্শন" রচনা করিয়া জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তেমনি আবার "শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ" রচনা করিয়া ভক্তিরও চরম ভাব বিকশিত করিয়াছেন!

ভক্তের ভক্তি চরম উৎকর্ষ হইলেই প্রেমে পরিণতি হয়, আবার জ্ঞানীর জ্ঞানও চরম অবস্থায় প্রেমেই পর্য্যবসিত হয়! ভক্ত সাধনার চরম অবস্থায় ভগবানের প্রেমময় মূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে

আত্মহারা হইয়া যান। আবার জ্ঞানীও সাধনার চরম অবস্থায় জ্ঞানময়ের চিন্ময় সত্তা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া, ব্রহ্মানন্দ-রসে ডুবিয়া যান! সুতরাং প্রথম অবস্থায় ভাবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃত ভক্ত এবং প্রকৃত জ্ঞানীতে কোন প্রভেদ নাই।

পরম ভাগবত মহামতি অক্রূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতে অনন্ত বিভূতি দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "এক্ষণে আপনার চক্ষুদ্বয়কে সূর্য্যরূপে, আঁখি-পলককে দিবারাত্রি রূপে, মুখকে অগ্নিরূপে শিরোদেশকে সপ্তস্বর্গরূপে, বায়ুকে মহাপ্রাণরূপে, শ্রুতিকে দশদিক্ রূপে, রোমাদিকে বৃক্ষ ও ঔষধিরূপে, কেশরাজিকে মেঘরূপে, অস্থিনখাদিকে পর্ব্বত রূপে, দেবতাগণকে অনন্ত বাহুরূপে, কুক্ষিকে মহাসাগররূপে, অবনীকে পদতলরূপে দর্শন করিতেছি!" ভগবৎ কৃপাবশে এইপ্রকার জ্ঞানের বিভূতি দর্শন করিয়া পরমভক্ত অক্রূর প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন।

পরমভক্ত অর্জ্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করতঃ; বিস্মিত, ভীত ও মুগ্ধ হইয়া, ভগবানকে সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করিয়াছিলেন; অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম ও স্তুতি করিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার ভক্তিভাব আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! সুতরাং জ্ঞানলাভ ভক্তির বিরোধী নহে, বরং উহা ভক্তিলাভের বিশেষ সহায়ক!—প্রকৃত ভক্ত এবং জ্ঞানীতে কোনও ভেদ নাই।

ব্রহ্মত্ব বিষয়টী বড়ই জটিল, ইহার সামান্য অংশও বাক্য বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাই জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবিষয়ে মোটামুটীভাবে বলিয়াছেন;—

: শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৪০ অধ্যায় ১২।১৩ শ্লোক

যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎ সুখান্নাপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥

অর্থাৎ যে লাভ হইতে আর অধিক লাভ নাই, যে সুখ হইতে আর অধিক সুখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

ঋষিপ্রবর মহম্মদ বলিয়াছেন "অনন্ত আকাশ যদি পত্র হয়, অনন্ত সিন্ধু যদি মসিরাশি হয়, অনন্ত স্বর্গবাসীগণ যদি লেখক হয়েন এবং অনন্তকাল ধরিয়া যদি লেখনী চালনা করা যায়, তথাপিও সেই অনন্তের কণামাত্রও গুণ কীর্ত্তন করা হয় না !!!"

যতদিন পর্য্যন্ত সেই আনন্দময়কে স্বস্বরূপে অবগতি না হইবে; ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখের অবসান হইবে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব লাভ, না জানিলেই দুঃখ।" * ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি প্রকৃত সুখ নহে; দুঃখকে চিরতরে উপশমিত করিতে না পারিলে আনন্দ লাভ হইবে না! অতএব দুঃখের চির-নিবৃত্তি করতঃ সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মত্ব লাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য !!

এক্ষণে এখানে জনৈক সাধকের একটী প্রার্থনা গীতি উদ্ধৃত করিয়া এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিলাম।

কবে, ভুবন ভরিয়ে তোমারে হেরিয়ে,
আপনা যাইব ভুলিয়া।
কবে, তোমার পরশে শীতল হইয়ে,
তোমাতে যাইব ডুবিয়া ॥

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। তৃতীয় অধ্যায় ১০ম শ্লোক।

কবে, অন্তরে বাহিরে তোমারে হেরিব,
কৃপাকণা পেয়ে আনন্দে ভাসিব,
সুখ দুঃখ আমি সমান গণিব,
হাসি মুখে লব বরিয়া।

কবে, প্রেমের নয়নে হেরিব জগত,
পুলকে শিহরি হইব প্রণত,
তোমাতে হারাব আমার আমিত্ব,
চির তরে যাব মিশিয়া॥

ব্রহ্মত্ব লাভের উপায়।

এক্ষণে ব্রহ্মত্বলাভের উপায় কি? এবিষয়ে কিছু বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভক্তিই মুক্তির কারণ; ভক্তি ব্যতীত কি ভক্ত, কি জ্ঞানী কেহই সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারে না!—জ্ঞানলাভের প্রথম সোপানই ভক্তি। এই ভক্তির সহিত "বিশ্বাসের" অতি নিকট সম্বন্ধ, কারণ বিশ্বাসের অভাব হইলে সেখানে আর ভক্তি থাকিবেনা! ভক্তিপথের ন্যায় জ্ঞানপথেও বিশ্বাস ব্যতীত সাধনায় এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই! কারণ জ্ঞানপথে প্রথমেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন!—এই শ্রদ্ধা বিশ্বাসেরই নামান্তর মাত্র; কেননা গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নামই "শ্রদ্ধা"; সুতরাং জ্ঞানপথে জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। জ্ঞানের অধিকারী নির্ব্বাচন করা বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী; এইসাধন চতুষ্টয় কি?— (১) "নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক" অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে আসক্তি রহিত ও নিত্য বিষয়ে অনুরক্তি

জ্ঞানের অধিকারী

হইয়া বিবেকের জাগ্রত অবস্থা (২) "ইহমুত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ", ইহকালের ভোগাসক্তির উপর এবং পরকালের স্বর্গাদি ভোগ কামনার উপর বৈরাগ্য উৎপন্ন হওয়া, অর্থাৎ তীব্র বৈরাগ্য (৩) "শমাদি ষটক্ সম্পত্তি" * অর্থাৎ শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান সম্পন্ন হওয়া (৪) "মুমুক্ষুত্ব" অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই চারিটী বিষয়ে অধিকার জন্মিলে, জ্ঞানসাধনায় অধিকারী হওয়া যায়। তবে শাস্ত্রকারগণ ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এবিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার না জন্মিলেও, জ্ঞানালোচনা করিতে বাধা নাই; কেননা জ্ঞানালোচনা করিতে করিতেই সাধন চতুষ্টয় বিষয়ে অধিকার জন্মিতে পারে।

এক্ষণে জ্ঞানপথে কিরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যাইতে পারে এবিষয়ে কয়েকটী সাধনার উল্লেখ করিব।

জ্ঞানপথের প্রধান সাধনা, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন

শ্রবণ কি?—গুরু, ধর্ম্মোপদেষ্টা কিম্বা সাধুমহাত্মার মুখে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব একনিষ্ঠ ও অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রবণ করার নাম "শ্রবণ"। মনন কি?—বিচার দ্বারা সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করতঃ নিঃসংশয় ভাবে শ্রুত বিষয় চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণা করার নাম "মনন"। নিদিধ্যাসন কি?—যে বিষয়ে শ্রবণ ও মনন করা হইল, তাহাই আপন জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সেই সেই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া; সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করতঃ আপনাকেও সেই ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে নিয়ত পরিচিন্তনের নাম নিদিধ্যাসন। আমি নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়—আমার আমিত্ব অন্তরে বাহিরে জগন্ময় সর্ব্বত্র বিস্তৃত, আমার আমিত্বের চিন্ময় উপাদান দ্বারাই এই জগতটা গড়া হইয়াছে! আত্মা যেমন দেহীর

* এই সকল বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সেইরূপ এই জগতটাও আমার নিকট প্রিয়তম ! আমি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ! আমি জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়—আমিই তুমি, তুমিই আমি ! এই প্রকারে ব্রহ্মেতে আত্ম-বিসর্জ্জনের নাম নিদিধ্যাসন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছিলেন ;—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং।"

হে মৈত্রেয়ী, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ; এইরূপে শ্রবণ মননাদি দ্বারা ইহাকে একবার লাভ করিলে, সকল জ্ঞানই লব্ধ হয়।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানের তিন প্রকার অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যাহারা শ্রবণ করা মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেন, তাঁহারা উত্তম অধিকারী। মনন করা মাত্র যাহাদের ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভূতি হয়, তাঁহারা মধ্যম অধিকারী। আর নিদিধ্যাসন দ্বারা যাহাদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তাহারা অধম অধিকারী।

পরমহংস পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামী রাজর্ষি জনকের নিকট শ্রবণ মাত্র অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ! আবার রাজর্ষি জনকও তদীয় গুরু মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট শ্রবণ মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

রাজর্ষি জনক উপযুক্ত অধিকারী হইয়া গুরুসকাশে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত গমন করিলে, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তোমার এক্ষণে কি অবস্থা ?

রাজর্ষি জনক ও অষ্টাবক্র

তাহাতে রাজর্ষি জনক উত্তর করিলেন, "আমি প্রথমতঃ কায়িক কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া শরীরকে সংযত করিয়াছি, তৎপর বাচিক কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া বাক্য সংযম করিয়াছি, এক্ষণে মানসিক চিন্তা নিরোধ করতঃ মনঃসংযম করিয়া

স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতেছি! গুরু দেখিলেন, শিষ্যের চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে; তখন বলিতে লাগিলেন, "বৎস তোমার বন্ধন কোথায়? তুমি যে চিরমুক্ত! তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার! এই যে তুমি জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছ, ইহাই তোমার বন্ধন! তুমি যে সমাধিলাভের অভিলাষ করিতেছ, ইহাই তোমার বন্ধন! তুমি নিঃসঙ্গ, নিরঞ্জন, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা! অতএব নীচ চিন্তা পরিত্যাগ করতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হও! এই প্রকার জ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজর্ষি জনকের অপরোক্ষ অনুভূতি হইয়াছিল।

জ্ঞানের সপ্তভূমি

পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে জ্ঞান-পথে সাতটী সোপান বা স্তর অতিক্রম করিতে হয়, এই সাতটী অবস্থাকে জ্ঞানের সপ্তভূমি বলা হইয়া থাকে যথা—(১) শুভেচ্ছা (২) বিচারণা (৩) তনুমানসা (৪) সত্ত্বাপত্তি (৫) অসংশক্তিকা (৬) পরার্থ ভাবিনী (৭) তুর্য্যগা। এই সাতটী অবস্থার প্রথম তিনটী সাধন অবস্থা এবং শেষের চারিটী সিদ্ধাবস্থা। প্রথম তিনটী অবস্থার নামান্তর, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—ইহাই সাধন অবস্থা। আর শেষ চারিটীর নামান্তর (১) ব্রহ্মবিদ্‌ (২) ব্রহ্মবিদ্বর (৩) ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান (৪) ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ—এই চারিটী সিদ্ধাবস্থা। সিদ্ধাবস্থায় অনুভূত আনন্দের তারতম্যানুসারেই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। আনন্দের আধিক্য হেতু এই অবস্থাগুলি পর পর শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বা তুরীয়াবস্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ !!

মহাবাক্য বিচার।

জ্ঞানপথের অন্য একটী সাধনা মহাবাক্য বিচার। বেদচতুষ্টয় মন্থন দ্বারা মহাবাক্যরূপ চারিটী অমৃতময় ফল উদ্ভব হইয়াছে! যথা—

(১) ঋক্‌বেদের মহাবাক্য—"প্রজ্ঞামানন্দং ব্রহ্ম"।
(২) সামবেদের মহাবাক্য—"তত্ত্বমসি"।
(৩) যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য—"অহংব্রহ্মাস্মি"।
(৪) অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"।

জগদ্‌গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী মঠ * স্থাপন করিয়া তদীয় প্রধান চারিজন শিষ্যকে ঐ চারিটী মঠের আচার্য্যপদ প্রদান করতঃ উপরোক্ত মহাবাক্য চারিটীর এক একটী এক এক মঠের চরমলক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তত্ত্ব পরিপূর্ণ এই মহাবাক্য চারিটী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে স্বরূপত্ব লাভ হয়। এক্ষণে এই মহবাক্য চারিটী সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ "প্রজ্ঞামানন্দং ব্রহ্ম" অর্থাৎ জ্ঞান এবং আনন্দই ব্রহ্ম! জ্ঞান এবং আনন্দের চরম অবস্থাই যে ব্রহ্মত্ব তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ "তত্ত্বমসি", ইহাতে তিনটী পদ আছে যথা, তৎ—ত্বং—অসি। "তৎ" শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, "ত্বং" পদদ্বারা জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং "অসি" পদ দ্বারা তৎ এবং ত্বং পদের ঐক্যতা সাধিত হইয়াছে; অর্থাৎ

* (১) উত্তরে বদারকাশ্রম ক্ষেত্রে, জ্যোতি বা যোশীমঠ—আচার্য্য ত্রোটক (হস্তামলক), এই মঠের তিনটী সম্প্রদায়, যথা—গিরি, পর্ব্বত, সাগর। (২) দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে, শৃঙ্গেরী মঠ—আচার্য্য পৃথ্বীধর বা সুরেশ্বর, এই মঠের তিনটী সম্প্রদায়, যথা—সরস্বতী, ভারতী, পুরী। (৩) পূর্ব্বে জগন্নাথ ক্ষেত্রে, গোবর্দ্ধন মঠ—আচার্য্য পদ্ম পাদ, এই মঠের দুইটী সম্প্রদায়, যথা—বন, অরণ্য। (৪) পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদা মঠ—আশ্চার্য্য বিশ্বরূপ, এই মঠেরও দুইটী সম্প্রদায়, যথা—তীর্থ, আশ্রম। এই চারিটী মঠে মোট দশটী সম্প্রদায় আছে, এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী-গণই "দশ নামা সন্ন্যাসী" বলিয়া কথিত হয়।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন হইয়াছে। তত্ত্বমসি মহাবাক্য সরলভাবে অর্থ করিলে এইরূপ হয় যথা—সেই পরমাত্মাই জীবাত্মা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অপরিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ পরমাত্মার সহিত পরিচ্ছিন্ন অবিশুদ্ধ জীবাত্মার ঐক্যতা বা মিলন কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জীবাত্মার ব্যবহারিক জীবভাবের সহিত পরমাত্মার মিলন হইতে পারেনা; কিন্তু জীবাত্মা শোধন দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে মিলনে আর বাধা নাই! বিশেষতঃ পরমাত্মা অখণ্ডহেতু জীবাত্মার সহিত পূর্ব্বাপর মিলিয়াই রহিয়াছে, কেবল জীবত্বের উপাধিটুকু পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হইল!—ইহাই "তত্ত্বমসি" বা জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন!!

তৃতীয়তঃ "অহংব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। এখানে আমিত্বের সহিত ব্রহ্মত্বের মিলন হইয়াছে। তত্ত্বমসির ন্যায় এখানেও "অস্মি" দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অবিশুদ্ধ, ব্যবহারিক জীবভাবাপন্ন আমির সহিত ব্রহ্মত্বের মিলন নহে; শোধন দ্বারা বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন, আত্মারাম আমিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে! যেমন বৃক্ষের অসার অংশ ও পত্রবল্কলাদি পরিত্যাগ করিয়া সারাংশই উত্তম কার্য্যের নিমিত্ত রাখা হয়, সেইরূপ জীবাত্মারও "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা অনিত্য ও বিকার পূর্ণ অংশ পরিত্যাগ করিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন! এবম্বিধ আত্মারাম আমির সহিত ব্রহ্ম চিরমিলনে আবদ্ধ! সুতরাং "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহা মুখে গর্ব্ব করার জিনিষ নহে!—ইহা সাধনার চরম অবস্থায় উপলব্ধির বস্তু!!

চতুর্থ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ এই আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই যে ব্রহ্ম এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই; তবে মহাবাক্যটী বিশ্লেষণ করিলে তিনটী পদ পাওয়া যায়। যথা,—অয়ং-আত্মা-ব্রহ্ম। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অয়ং শব্দদ্বারা অদ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়াছে, কেননা "আত্মাই ব্রহ্ম" বলিলেই তো যথেষ্ট হইত। এ বিষয়ে ভগবান শঙ্করাচার্য্য সুন্দর মীমাংসা করিয়া

গিয়াছেন। এক ব্যক্তি বন্ধুর সহিত কথোপকথনের সময়, তাহার পূর্ব্ব পরিচিত দেবদত্তকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই সেই দেবদত্ত!" এখানে, এই—সেই—দেবদত্ত দ্বারা এক ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেইরূপ "অয়ং আত্মা ব্রহ্ম" দ্বারা অদ্বৈত ভাব নষ্ট হয় নাই।

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিচার।

জ্ঞান-পথের একটী অন্যতম সাধনা "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব" বিচার। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কি?—(১) মূলা প্রকৃতি (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা) (২) মহত্তত্ত্ব (সত্ত্বগুণের প্রথম বিকার) (৩) অহংতত্ত্ব (রজগুণের প্রথম বিকার) (৪) শব্দতন্মাত্র * (৫) স্পর্শতন্মাত্র (৬) রূপ তন্মাত্র (৭) রস তন্মাত্র (৮) গন্ধ তন্মাত্র [এই পাঁচটীর নাম "পঞ্চতন্মাত্র"—ইহারা তমগুণের প্রথম বিকার।] (৯) মন (অহংতত্ত্ব হইতে জাত) ["একাদশ ইন্দ্রিয়" যথা—মন+ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়+ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়।] (১০) শ্রবণেন্দ্রিয় (১১) স্পর্শেন্দ্রিয় (১২) দর্শনেন্দ্রিয় (১৩) বাগিন্দ্রিয় (১৪) ঘ্রাণেন্দ্রিয় [ইহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—অহংতত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশে জাত †] (১৫) রসনেন্দ্রিয় (১৬) পাণি (১৭) পাদ (১৮) পায়ু (১৯) উপস্থ [এই পাঁচটীর সূক্ষ্মশক্তি বা ইন্দ্রিয়—ইহাদের নাম পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—অহংতত্ত্বের রাজস অংশে জাত] (২০) ব্যোম্‌তত্ত্ব (২১) মরুত্তত্ত্ব (২২) তেজতত্ত্ব (২৩) অপ্‌তত্ত্ব (২৪) ক্ষিতিতত্ত্ব [এই পাঁচটী "পঞ্চ মহাভূত" অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও

---

* "তন্মাত্র" অর্থ সেই মাত্র, অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্রে কেবল শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই! রূপ তন্মাত্রে কেবল রূপ, রস তন্মাত্রে কেবল রস! এই জন্যই নাম তন্মাত্র।

† কাহারও মতে পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রাজস অংশে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

মাটী এই পাঁচটীকে মহাভূত বলা হয়,—ইহারা পঞ্চতন্মাত্রের তামস অংশ হইতে পর পর উদ্ভব হইয়াছে]। এই চব্বিশটী তত্ত্বকেই "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব" বলা হইয়া থাকে।

কোন কোন শাস্ত্রকার আত্মাকে একটী তত্ত্বরূপে গণ্য করিয়া মোট "পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব" বিচার করিয়াছেন; আবার কেহবা পরমাত্মাকে চরম তত্ত্বরূপে ধরিয়া "ষড়্‌বিংশতত্ত্ব" স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি, চৈতন্যময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ চব্বিশটী স্তরে বিকার প্রাপ্ত হইয়া এই জীবজগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; আর সেই চৈতন্যময় পুরুষ নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্তভাবে সাক্ষীরূপে প্রকৃতিতে ওতঃপ্রোতভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রকৃতির এই বিকৃত অবস্থা বা স্তরগুলিই "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব"—ইহাই ব্রহ্মের সগুণভাব। ইহার দুই প্রকার বিচার আছে। প্রথম বিচার, ব্রহ্ম কিরূপে জীব জগতরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন; অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব—ইহাই ব্রহ্মের সঙ্কোচভাব (অণুলোম)। এই বিচার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সর্ব্বনিম্ন অবস্থা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জীব পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় বিচার, জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্য্যন্ত; অর্থাৎ জীব "নেতি নেতি" বিচার * দ্বারা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া, কিরূপে ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে পারে, এই প্রকার বিচার—ইহা ব্রহ্মের বিকাশভাব (বিলোম)। ব্রহ্মের সঙ্কোচভাবে তৎশক্তি মায়া বা প্রকৃতির বিকাশ হয়, আর মায়ার সঙ্কোচভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ বিকাশ হইয়া থাকে। তবে ব্রহ্মত্বে উপনীত হইলে এই সব সঙ্কোচ, বিকাশ, সকলই ব্রহ্মময় হইয়া যায়! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "সিড়ি অতিক্রম করিতে করিতে ছাদে উঠিতে হয়, কিন্তু একবার ছাদে উঠিলে দেখা

* যেমন আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন নহি, এই প্রকারে অনিত্য ও বিকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বস্তু অনুসন্ধান করাকে "নেতি নেতি" বিচার কহে।

যায় যে, সব একাকার! ছাদও যা, ঐ সিঁড়িগুলিও তা—কেবল ইট, চূণ আর সুরকি!" অর্থাৎ মোহান্ধ নয়নে জীবজগত বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইলেও, জ্ঞান দৃষ্টিতে সকলই চিন্ময় বলিয়া অনুভূত হয়!

সমষ্টি ও ব্যষ্টি

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে দুইটী বিচিত্র ভাব বিদ্যমান আছে, যথা, সমষ্টি ও ব্যষ্টি। এই সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীন সাম্যভাব বিরাজিত থাকিয়া, জটিল ও দুর্ব্বোধ্য সৃষ্টিতত্ত্বকে শৃঙ্খলাযুক্ত ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বা অনন্ত সৌর-জগতের * যে তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা, একটি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই তত্ত্ব এবং সেই শৃঙ্খলা। আবার একটী ব্রহ্মাণ্ডের যে তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা, একটী দেহ-ভাণ্ডেরও (মানব-দেহের) সেইরূপ তত্ত্ব! সেইরূপ শৃঙ্খলা! ইহাই সৃষ্টি তত্ত্বের অপূর্ব্ব বৈচিত্র ও রহস্য।

এক্ষণে ব্রহ্ম হইতে জীব পর্য্যন্ত সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করা যাউক।

সৃষ্টি-রহস্য

নির্গুণ † ব্রহ্মে যখন প্রজা সৃষ্টি করতঃ বহু হইবার ইচ্ছাশক্তি জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি সগুণ হইলেন; অর্থাৎ যে গুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাতে অব্যক্তাবস্থায় বিলীন ছিলেন, তিনি ত্রিগুণের বিকাশ করতঃ ব্রহ্মেরই একাংশে ব্যক্তাবস্থায় সাম্যভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের যে অংশে গুণময়ী প্রকৃতি অধিষ্ঠিতা হইলেন, তিনিই চৈতন্যময় "পুরুষ"—অর্থাৎ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম চৈতন্যই "পুরুষ", আর গুণময়ী প্রকৃতিই "মূলা প্রকৃতি" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। এই

---

* পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও অনন্ত সৌর-জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

† নির্গুণ অর্থ গুণের অভাব নহে—ত্রিগুণের অব্যক্ত অবস্থা, কেননা যাহাতে যে বস্তুর অভাব, তাহা হইতে সেই বস্তুর আবির্ভাব কখনও হইতে পারেনা! যেমন অগ্নি উৎপাদক শলাকাকে নিরগ্নি শলাকা বলা যায় না!—উহা অগ্নির অব্যক্ত অবস্থা মাত্র!

প্রকৃতি-রূপা মহাশক্তিই মহামায়া *; শাস্ত্রেও আছে যথা—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ); অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। প্রকৃতি চৈতন্যময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—প্রকৃতিই সৃষ্টি প্রবাহের উপাদান কারণ, আর পুরুষই সৃষ্টি কার্য্যে নিমিত্ত কারণ।

প্রকৃতি যখন সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমেই প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণ বিকাশ হইল, ইহাই প্রকৃতির সর্ব্বপ্রথম বিকার—ইহাকে "মহত্তত্ত্ব" বলা হয়। তৎপর প্রকৃতিতে রজগুণ বিকাশ হইল—ইহার নাম "অহংতত্ত্ব"। অতঃপর ক্রমে পর পর প্রকৃতিতে তমগুণের পাঁচটী বিকার হইল—ইহাদিগকে "পঞ্চ তন্মাত্র তত্ত্ব" বলা হইয়া থাকে, যথা—"শব্দ-তন্মাত্র", "স্পর্শ-তন্মাত্র", "রূপ-তন্মাত্র", "রস-তন্মাত্র" এবং "গন্ধ-তন্মাত্র"। প্রকৃতির এই সাতটী বিকার যুক্ত অবস্থাই যাবতীয় সৃষ্টির "মহাকারণ!"

কেহ কেহ এই মহাকারণ রূপ সাতটী মূল তত্ত্বকে "সপ্ততত্ত্ব" বলিয়া থাকেন। এই সাতটী মূল তত্ত্ব পরস্পর মিশ্রিত হইয়া অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে! সপ্ত তত্ত্বের এই মিশ্রিত অবস্থাকে কেহ কেহ "ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ" বা "কারণ জল" বলিয়া থাকেন। যেমন একটী সরোবরে বহু পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিলে অতীব মনোরম শোভা হয়, সেই পদ্মরাশির মধ্যে কতক কোরকাবস্থায়, কতক অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত, কতক পূর্ণ বিকশিত, আবার কতকবা ধ্বংশোন্মুখী! যুগপৎ এই দৃশ্য দেখিলে যেমন চিত্ত প্রফুল্লিত হয়, সেইরূপ অনন্ত কারণ জলে, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড-

* কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তিকে "যোগমায়া" এবং তাঁহার ত্রিগুণময়ী শক্তিকে "মহামায়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই মহামায়াই "মহাবিদ্যা" বা "মহাশক্তি"। বিদ্যা বা চিৎশক্তি (পরা প্রকৃতি)+ অবিদ্যা বা মায়া শক্তি (অপরা প্রকৃতি) = মহাবিদ্যা বা মহাশক্তি বা মহামায়া। [জীবমায়া = অবিদ্যা]।

রূপ অনন্ত পদ্মরাশি সৃষ্টি প্রলয়ের অপূর্ব্ব ভাব লইয়া কতক ফুটিয়া উঠিতেছে, কতক ডুবিয়া যাইতেছে, আবার কতকবা অর্দ্ধ নিমীলিত অবস্থায় বিরাজ করিতেছে!—এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের দ্রষ্টা একমাত্র সেই চৈতন্যময় পরম পুরুষ!—তিনিই ব্রহ্মানন্দে এই বিশ্বলীলা দর্শন করিতেছেন! —নিজেই নিজের রূপ দর্শনে মুগ্ধ!!

ব্রহ্মাণ্ড-রহস্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি ভাবে যে তত্ত্ব, ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেতেও সেই তত্ত্ব; সুতরাং এক্ষণে এই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত "লোক" এবং সপ্ত "পাতাল" এই চতুর্দ্দশটী ভুবন আছে। সপ্ত লোক যথা—ভূভু'বঃ সঃ মহ, জন, তপ ও সত্য। আর সপ্ত পাতাল যথা—অতল, বিতল, নিতল, সুতল, মহাতল, রসাতল, ও তলাতল। এই সপ্তলোক মধ্যে ভূলোক সর্ব্ব নিম্নের স্তর, অন্যান্য লোকগুলি পর পর ক্রমশঃই বিকাশের দিকে গিয়াছে। আর তলাতল হইতে পঃবর্ত্তী পাতালগুলিও ক্রমশঃই অবিকাশের অবস্থা! প্রত্যেক লোকের সহিত এক একটী পাতালের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; ভূলোক যতদূর বিকশিত হইয়াছে, তৎ সম্পর্কিত পাতালটীতে ঐ অনুপাতেই অবিকাশের অবস্থা রহিয়াছে! এইরূপে যেমন সত্যলোক বিকাশের চরম অবস্থা, সেইরূপ তৎসম্পার্কিত পাতালটীও অবিকাশের চরম অবস্থা। কাহারও মতে প্রত্যেক লোকের গর্ভস্থ গভীর অন্ধকারময় অবিকাশ স্থানই তৎতৎ লোকের পাতাল!

মহাকারণরূপ সপ্ততত্ত্ব হইতে প্রকৃতি উপাদান সংগ্রহ করতঃ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে মহত্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং বুদ্ধিতত্ত্বের চরম উৎকর্ষ দ্বারা "সত্যলোক" সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপর অহং তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি মন ও ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার চরম উৎকর্ষ দ্বারাই "তপলোকের" সৃষ্টি। শব্দ-

তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি আকাশ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার চরম বিকাশে "জনলোক" সৃষ্টি হইয়াছে। স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বায়ুতত্ত্ব ও মহাপ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই চরম উৎকর্ষ হইয়া "মহলোক" সৃষ্টি হইয়াছে। রূপ-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি তেজ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহারই চরম বিকাশে স্বঃ বা দেবলোক সৃষ্টি হইয়াছে। রস-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি অপ্ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহারই চরম উৎকর্ষে "ভুবলোক" অর্থাৎ পিতৃ বা প্রেতলোক সৃষ্টি হইয়াছে। গন্ধ-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি ক্ষিতিতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা হইতেই "ভূলোকের" † সৃষ্টি হইয়াছে। এই তত্ত্বগুলি মোটামুটী ভাবে দেওয়া হইল; প্রত্যেক তত্ত্বের অন্তর্গত বহু গভীর তত্ত্বের সমাবেশ রহিয়াছে; বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইল না।

পঞ্চভূতের "পঞ্চীকরণ" দ্বারা প্রত্যেক লোকস্থিত জীবজগতের উপাদান গঠিত হইয়াছে। * ভূলোকের জীব হইতে ভুবলোকের জীব সূক্ষ্ম, আবার

---

† আমাদের পৃথিবী ভূলোকেরই অন্তর্গত একটী দ্বীপ বিশেষ। ভূলোকের অন্তর্গত ভূমণ্ডলে সাতটী দ্বীপ আছে, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর; একজন্য পৃথিবী "সপ্তদ্বীপা" বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান ভৌগলিক পৃথিবীই জম্বু দ্বীপ, ইহা আবার নয়টী ভাগে বিভক্ত, ইহাদিগকে "বর্ষ" বলা হয়; ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত "ইলাবর্ষ" নামক অংশ।

* পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে মূলতত্ত্ব দ্বারা যে লোক সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ মূল ভূত অর্দ্ধেকাংশ এবং অবশিষ্ট চারিটী ভূত সমান চারিভাগে বিভক্ত করতঃ বাকী অর্দ্ধেকাংশ পূরণ করার নাম "পঞ্চীকরণ।" যথা—ভূলোকের জীবজগতের উপাদান, ক্ষিতি ।৷০ + অপ্ ৵০ + তেজ ৵০ + বায়ু ৵০ + আকাশ ৵০ = ১৲ এইরূপ ভুবলোকের জীবের উপাদান অপ্ ।৷০ অবশিষ্ট প্রত্যেকটী ভূত ৵০ অংশ। দেবলোকের জীবের (দেবতাদের) উপাদান তেজ ।৷০ অবশিষ্ট চারিভূত প্রত্যেকটী ৵০ অংশ। মহলোকের জীবের উপাদান বায়ু ।৷০ অন্যান্য ভূত

ভুবলোক হইতে দেবলোকের জীব আরও সূক্ষ্ম; এইরূপে উচ্চ উচ্চ লোকগুলি ক্রমশঃই সূক্ষ্মের দিকে বিকাশ হইয়াছে। কেননা ক্ষিতি হইতে অপ্ সূক্ষ্ম, অপ্ হইতে তেজ সূক্ষ্ম, তেজ হইতে বায়ু আরও সূক্ষ্ম, বায়ু হইতে আকাশ আরও সূক্ষ্ম, আকাশ হইতে মন সূক্ষ্মতর এবং মন হইতে বুদ্ধি আরও সূক্ষ্মতম!

ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিভাবে যে সকল তত্ত্ব আছে, দেহ-ভাণ্ডেও (জীবদেহে) ব্যষ্টিভাবে সেই সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব

জীবদেহ-রহস্য চতুর্দ্দশ ভুবন প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্বই জীবদেহে বিরাজিত; ইহা কবির কল্পনা নহে—যোগীর উপলব্ধ সত্য! মানবদেহে, মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধদিকে ক্রমশঃই বিকাশের অবস্থা, আর কটিদেশ হইতে অধঃদিকে ক্রমশঃই অবিকাশের অবস্থা! বিকাশ অবস্থাতেই "সপ্ত লোক" বা "সপ্ত চক্র" বা "সপ্ত পদ্ম" সুসজ্জিত! আর অবিকাশের স্থানেই সপ্ত পাতাল বিরাজিত। মানবদেহে সপ্ত পাতালের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান উত্তর গীতায় বলিয়াছেন যথা,—

"অধঃ পাদেঽতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চবিতলং বিদুঃ।
নিতলং পাদসন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে॥
মহাতলং হি জানুঃস্যাৎ উরুদেশে রসাতলং।
কটি স্তলাতলং প্রোক্তং সপ্ত পাতাল সংজ্ঞয়া॥

অর্থাৎ চরণের অধোভাগ অতল, চরণে বিতল, পাদসন্ধি নিতল, জঙ্ঘা সুতল, জানু মহাতল, উরু রসাতল, কটি তলাতল এই সপ্ত পাতাল কথিত হইল।

॥০ এইরূপে; জনলোকের জীবের উপাদান আকাশ ॥০ অন্যান্য ভূত ॥০। এই প্রকারে পঞ্চভূতের মিলন দ্বারা প্রত্যেক লোকস্থিত জীবাদির উপাদান প্রস্তুত করাকে "পঞ্চীকরণ" বলা হইয়া থাকে।

মানবদেহে বিশেষ বিশেষ সন্ধি স্থানের সমান্তরালে মেরু দণ্ডের অভ্যন্তরে সাতটী "চক্র" বা "পদ্ম" আছে। গুহ্য দেশে মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্ন সীমায়, (১) মূলাধার চক্র বিরাজিত—ক্ষিতি তত্ত্ব, ইহাই ভূলোকের স্থান। লিঙ্গমূলের সমান্তরালে, (২) স্বাধিষ্ঠান চক্র—অপ্‌তত্ত্ব, ভুবলোকের স্থান। নাভিদেশে, (৩) মণিপুর চক্র—তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব, স্বঃবা দেবলোকের স্থান। হৃদয় প্রদেশে, (৪) অনাহত চক্র—বায়ুতত্ত্ব, মহলোকের স্থান। কণ্ঠদেশে (৫) বিশুদ্ধ চক্র—আকাশ তত্ত্ব, জন লোকের স্থান। ভ্রূমধ্যে (৬) আজ্ঞা চক্র—মনতত্ত্ব, তপলোকের স্থান। ব্রহ্মরন্ধ্রে, (৭) সহস্রার—বুদ্ধিতত্ত্ব, সত্য-লোকের স্থান।

উপরোক্ত সাতটী চক্র বা পদ্ম মানবদেহে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। ইহাদের সূক্ষ্মভাব ছাড়িয়া দিলেও যে যে স্থানে ঐ চক্রগুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই প্রদেশে তত্ত্বগুলির স্থূলভাবের ক্রিয়াও বিদ্যমান; যথা—(১) গুহ্য প্রদেশে পৃথিবীতত্ত্ব, স্থূলভাব, মলের ক্রিয়া; (২) লিঙ্গমূলে, অপ্‌তত্ত্ব, স্থূলভাব, মূত্রের ক্রিয়া; (৩) নাভি প্রদেশে, তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব—স্থূলভাব, পাকস্থলীর ক্রিয়া; (৪) হৃদয়ে, বায়ুতত্ত্ব—স্থূলভাব, প্রাণের ক্রিয়া; (৫) কণ্ঠদেশে, আকাশতত্ত্ব—স্থূলভাব, শব্দের ক্রিয়া; (৬) ভ্রূমধ্যে, মনতত্ত্ব,—সূক্ষ্মভাব, লয়ের স্থান (ত্রিকুট) চিন্তার ক্রিয়া; (৭) মস্তিষ্ক প্রদেশে, বুদ্ধিতত্ত্ব—সূক্ষ্ম-ভাব, স্মৃতিমেধা বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া সুতরাং যোগীঋষিগণ যে পদ্ম বা চক্রের স্থান মানবদেহে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ স্থানগুলি একেবারে কল্পিত নহে! উহাদের সহিত স্থূল তত্ত্বেরও অতি সুন্দর বিস্ময়জনক মিলন রহিয়াছে!!

জীবদেহে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন প্রকার দেহ আছে। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের স্থূলাংশে "স্থূল শরীর" সৃষ্টি হইয়াছে। বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, এই সপ্তদশ পদার্থ মিলিত হইয়া "সূক্ষ্ম শরীর" হইয়াছে!—ইহার অন্য নাম "লিঙ্গ শরীর"। আর জীব

ব্রহ্মের একত্ব-জ্ঞান নাশক অজ্ঞানতাই "কারণ শরীর" বলিয়া কথিত হয়। *

জীবদেহে পঞ্চকোষ বিদ্যমান আছে, যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, এবং আনন্দময় কোষ। স্থূল শরীরের নাম অন্নময় কোষ, ইহার উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ অন্ন; পিতা মাতার ভুক্ত অন্নের বিকার ও পরিণতি রূপ শোণিত-শুক্র দ্বারা ইহার উৎপত্তি, আবার অন্নাদি ভুক্ত দ্রব্য দ্বারাই ইহার স্থিতি (কলিতে অন্নগত প্রাণ), এজন্য ইহার নাম "অন্নময় কোষ"।

পঞ্চকোষ

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু মিলিত হইয়া "প্রাণময় কোষ" হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া "মনোময় কোষ" হইয়াছে। যেরূপ অন্নের বিকার দ্বারা অন্নময় কোষ এবং প্রাণের বিকার দ্বারা প্রাণময় কোষ হইয়াছে, সেইরূপ মনোময় কোষও মনের বিকারে উৎপন্ন। আত্মা নির্লিপ্ত হইলেও মনের বিকার বশতঃই সুখী দুঃখী ইত্যাদি অভিমান যুক্ত হইয়া শোক মোহাদিতে আচ্ছন্ন হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া "বিজ্ঞানময় কোষ" হইয়াছে ; ইহা বুদ্ধির বিকারে উৎপন্ন। বুদ্ধির বিকারেই নির্ব্বিকার, অকর্ত্তা, সাক্ষীরূপে অবস্থিত আত্মাও "আমি কর্ত্তা" এই প্রকার অভিমান যুক্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা জনিত প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ এই ত্রিবিধ আনন্দ-বৃত্তিমান অন্তঃকরণের অবস্থাকে "আনন্দময় কোষ" বলা হইয়া থাকে। অভিলষিত বস্তু দর্শন জনিত সুখকে "প্রিয়," ঐ বস্তু লাভে যে সন্তোষ হয় তাহার নাম "মোদ" আর অভিলষিত বস্তু ভোগজনিত সুখের নাম "প্রমোদ," এই সুখত্রয়ের মিলিত অবস্থায়ই "আনন্দময় কোষ", ইহা আনন্দের বিকার হইতে জাত। ইহারই প্রভাবে প্রিয়-মোদ-প্রমোদ

* শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে নষ্ট হয় এজন্য নাম শরীর (স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ)।

রহিত অপরিচ্ছিন্ন অভোক্তা আত্মাও প্রিয়-মোদ-প্রমোদবান, পরিচ্ছিন্ন সুখযুক্ত এবং "আমি ভোক্তা" এই প্রকার অভিমানী হয় *।—ইহাই আত্মার শেষ আবরণ।

জীবের অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত (১) মন—সংশয়াত্মক বৃত্তি, (২) বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি (৩) অহং—অভিমানী বৃত্তি (৪) চিত্ত—সংস্কার বৃত্তি। এই চারিটী বৃত্তির কার্য্যই যুগপৎ সম্পন্ন হয়। যেমন একটী গোলাপ ফুল দর্শন করা মাত্র মন প্রশ্ন করিল—এটী কি?—বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করিয়া দিল—ইহা গোলাপ ফুল, অহং তৎক্ষণাৎ অভিমান করিল আমি গোলাপ ফুল দর্শন করিতেছি, আর দেশ কাল পাত্রানুসারে অর্থাৎ যে দেশে, যে অবস্থায় এবং যে সময়ে এই দর্শন হইল, তাহাই চিত্তে দাগ লাগিয়া গেল, অর্থাৎ চিত্ত সংস্কাররূপে উহা ধারণা করিয়া লইল। এই চারিটী কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও উহা একই সময়ে যুগপৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জীবশরীর চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে সৃষ্টি হইয়াছে, এই তত্ত্বগুলিই প্রকৃতি; আর যিনি এই জীবদেহে দেহী হইয়া নির্ব্বিকার ভাবে সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই চৈতন্যময় আত্মারাম পুরুষ!—ইনি সেই ব্রহ্মচৈতন্যেরই অংশ জীবচৈতন্য!—জীব ভাবটী পরিত্যাগ হইলেই মহাসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায়, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হইবে!

সগুণ ব্রহ্মের গুণময় অবস্থাই কতকটা বিচারের যোগ্য, উহাই জ্ঞানীর

* কাহারও মতে আত্মা কোন অবস্থাতেই সুখ দুঃখে লিপ্ত বা মোহাদিতে আচ্ছন্ন হয়না, কিম্বা আমি কর্ত্তা, কি ভোক্তা, এই প্রকার অভিমানযুক্তও হয়না; তবে জীবদেহস্থিত অহংকারই জড় হইলেও আত্মার সংসর্গে "অধ্যাস" হেতু চৈতন্যের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়! লৌহ যেমন জড় হইলেও অগ্নির সংসর্গে উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নির ন্যায় ক্রিয়াযুক্ত হয় (ইহারই নাম "অধ্যাস") সেইরূপ দেহস্থ অহংকারও আত্মার সংসর্গে চৈতন্যবৎ ক্রিয়াযুক্ত হইয়া আমি সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা, ভোক্তা এই প্রকার অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে।

জ্ঞাতব্য বিষয়! নচেৎ গুণাতীত নির্গুণ অবস্থায় কে কাহাকে জানিবে?—সেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান সকলই একত্বে বিলীন! গুণাতীত নির্গুণ অবস্থা মনবুদ্ধির অতীত, সুতরাং মন বুদ্ধি অহং দ্বারা সেই অবস্থা চিন্তা করা যায় না!—নিজে মনবুদ্ধির অতীত গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে, অর্থাৎ সমাধির চরম অবস্থায় উহা একমাত্র উপলব্ধি হইতে পারে!!

মহর্ষি কপিল সাংখ্য-দর্শনে বলিয়াছেন যে, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের বিবেক জ্ঞানে দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিলাভ হয়। স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

"শক্তি জ্ঞানং বিনাদেবী মুক্তি র্হাস্যায় কল্পতে।"

হে দেবী, শক্তি জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ করা হাস্যাস্পদ ও বৃথা। এই শক্তি-তত্ত্বই জগত্তত্ত্ব! শ্রুতি বলিয়াছেন,—"য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি, স পাপ্মানং তরতি, সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতী শ্রিয়মশ্নুতে।" অর্থাৎ যিনি এই মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, সর্ব্ববিধ পাপ অতিক্রম করিয়া ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন। সুতরাং জ্ঞান-পথের সাধকের পক্ষে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে শ্রবণ ও মনন করা বিধেয়; এইরূপে জীবজগত-রহস্য অবগত হইয়া, "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা জীবভাব পরিত্যাগ করতঃ চৈতন্যময় ব্রহ্মসত্তার সহিত সতত নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য।—ইহাদ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ সুনিশ্চিত!!

জীবের দুঃখে সাধক গাহিয়াছেন,—

"প্রকৃতির দ্রষ্টা হয়েও ভুলে র'লে বিকারেতে,
রূপ রসাদির ধাঁধায় পড়ে, হাস কাঁদ সুখ দুখেতে!
সুপ্তসিংহ তোমরা সবে, ভুলে কেন রয়েছরে,
অমৃতের সন্তান হয়ে, হেন দশা সাজে কিরে?"

নির্ব্বাণ।

জ্ঞানপথে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করাই সাধনার চরম অবস্থা। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ—ইহাই নির্ব্বাণ। জীবত্ব পরিত্যাগ করতঃ আমিত্বের বিশ্বময় প্রসারণ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্যতা সম্পাদনের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ অর্থে "নিবিয়া যাওয়া' বা আমিত্বের বিনাশ নহে—আমিত্বের চরম বিকাশ করতঃ স্বস্বরূপে পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম নির্ব্বাণ! এক কথায়, জীবাত্মা পরমাত্মার অপরোক্ষ মিলনের নাম নির্ব্বাণ।

জ্ঞানপথে, সাধনার উচ্চাবস্থায় সালোক্যাদি মুক্তির কতকটা অবস্থাও সাধকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যখন সাধকের মনে এই ভাব উদিত হয় যে, ব্রহ্মেতেই সমস্ত চরাচর জীবজগত ডুবিয়া রহিয়াছে, সুতরাং আমিও ব্রহ্মলোকেই বাস করিতেছি!—জ্ঞান-সাধকের এবম্বিধ অনুভূতির নাম সালোক্য মুক্তি। যখন সাধক অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মনে হয় আমি ব্রহ্মের নিকটেই অবস্থান করিতেছি!—ইহাই সামীপ্য মুক্তি। যখন ব্রহ্মসত্ত্বায় ডুবিয়া সাধক আনন্দ-রস পান করিতে থাকেন —ইহাকে সার্ষ্টি মুক্তি বলা যাইতে পারে। জ্ঞান-সাধক নিদিধ্যাসন দ্বারা যখন ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন—ইহাই সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি! পরিশেষে যখন সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে আত্মবিসর্জ্জন করতঃ সাধক ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন, ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি!

মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে যাব!"

ইহা বিকারগ্রস্তের প্রলাপোক্তি নহে! গভীর তত্ত্ব ও অদ্বৈত ভাবে ইহা পরিপূর্ণ। "তুমি খাও" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার আমিত্ব তোমাতে বিসর্জ্জন করাইয়া লও!—ইহা ভক্তি পথ। আর "আমি খাই" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার আমিত্ব এরূপ প্রসার করিব যে তোমাকেও আমার

সেই আমিত্বের মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিব!—ইহা জ্ঞানের চরম অবস্থা। *

"জ্ঞানের প্রাণায়াম" দ্বারা সাধক মুক্তি-পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। জীবজগতকে ব্রহ্মরূপে দর্শন না করিয়া মহামায়ার প্রভাবে যে ভেদভাবে দর্শন হইতেছে, জগত হইতে এই ভেদভাব বা অজ্ঞানতাকে প্রত্যাহার করিয়া আনার নাম "পূরক"! অজ্ঞানতা প্রত্যাহার করতঃ স্বরূপ জ্ঞান লাভে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম "কুম্ভক"! তৎপর স্বরূপ জ্ঞানে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমিত্বকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দেওয়ার নাম "রেচক"—ইহাই জ্ঞানীর প্রাণায়াম, এই প্রকারে সাধক ক্রমে প্রেমের অবস্থা লাভ করতঃ একমাত্র চৈতন্য সত্তায় অবস্থান করেন, অর্থাৎ তখন তিনি "কেবল" হইয়া যান, ইহাই "কৈবল্য" বা নির্ব্বাণ মুক্তি।

নির্ব্বাণ মুক্তিকে শাস্ত্রকারগণ "বিদেহ" মুক্তিও বলিয়া থাকেন। "বিদেহ" অর্থ "ভাবি দেহের অনারম্ভত্ব"। যাহারা বিদেহ মুক্ত হইয়াছেন মৃত্যুর পর তাঁহাদের আর কোন প্রকার দেহ আশ্রয় করিতে হইবে না, কিম্বা 'লিঙ্গ-শরীরাদি' কোন প্রকার দেহ উৎক্রান্তিও হইবেনা; অর্থাৎ তাঁহারা জীবন্মুক্ত

* মুক্তিলাভের প্রধান দুইটী পথ আছে, যথা—ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ; একটী দ্বারা সাধক ছোট হইতে থাকে, অপরটী দ্বারা ক্রমেই সাধক আমিত্বের প্রসার দ্বারা বড় হয়! কোন এক ব্যক্তিকে যদি কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তাহার বন্ধনরজ্জুগুলি যদি তাহাকে জালের মত জড়াইয়া রাখে, তাহা হইলে সে ঐ বন্ধন দশা হইতে দুই প্রকার উপায়ে মুক্ত হইতে পারে; প্রথম উপায় যদি সে খুব ছোট হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বন্ধনরজ্জুগুলি শিথিল হইয়া যাইবে, আর সে অনায়াসে বন্ধন হইতে বাহির হইয়া পড়িবে! —ইহা ভক্তিপথ। দ্বিতীয় উপায়, ঐ ব্যক্তি যদি খুব বড় হইতে পারে, তাহা হইলেও বন্ধনরজ্জুগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে, আর সেওমুক্ত হইবে—ইহা জ্ঞানপথ তাই জ্ঞানীগুরু উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যকে সন্ন্যাস দিবার সময় বলেন 'নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী' পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া বাহির হইলে সিংহের যেমন বিক্রম হয়, তুমিও সেইরূপ জগতের মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বাহির হইলে!—মহামায়ার বন্ধন কাটাইবার এই দুইটিই প্রধান উপায়।

অবস্থায় যেরূপ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মৃত্যুরূপী যবনিকার পরপারেও তাঁহারা পূর্ব্ববৎ স্ব স্বরূপেই অবস্থান করেন। জীবিতকালেই মুক্তির অবস্থা লাভ করার নাম জীবন্মুক্তি। মনোনাশ, অবিদ্যানাশ এবং তত্ত্বজ্ঞানোদয় এই তিনটী জীবন্মুক্তের লক্ষণ। মনোনাশ কি? বাসনা ক্ষয়ের নাম মনোনাশ; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প শূন্য হওয়া। অবিদ্যা নাশ কি? অবিদ্যা বা জীবমায়ার চারিপ্রকার কার্য্য আছে, যথা—(১) অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, (২) অশুচিতে শুচিবুদ্ধি (৩) অসুখে সুখবুদ্ধি এবং (৪) অনাত্ম বিষয়ে আত্ম বুদ্ধি। অবিদ্যাজনিত এই সকল মোহ বা ভ্রান্তি নাশ করার নাম "অবিদ্যানাশ"। যিনি এই প্রকার অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকে নাশ করতঃ সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি অবিদ্যা, অস্মিতা (অহংকারের সূক্ষ্মাবস্থা—কর্ত্তৃত্বাভিমান), রাগ (প্রাপ্তি ইচ্ছা) দ্বেষ (প্রাপ্তি অনিচ্ছা অর্থাৎ ঘৃণা বা বিরক্তি) এবং অভিনিবেশ (পুনঃপুনঃ ভোগ লিপ্সা) এই পাঁচটি দুঃখের নিবৃত্তি করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত! যিনি ঊর্দ্ধ অধঃঅন্ত মধ্য সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড সমরস সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, এরূপ অনুভব করেন তিনিই জীবন্মুক্ত!

জীবন্মুক্তি

অধিকার ভেদ।

অধিকারভেদে এপর্য্যন্ত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানপথের বহু সাধনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে অধিকারভেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অধিকারভেদ সনাতন-ধর্ম্মের বিশেষত্ব। এজগতে কত ধর্ম্মের উত্থান পতন হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু সনাতন-ধর্ম্ম অনাদি কাল হইতেই জীবগণকে শান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে; ইহার বিনাশ নাই। প্রায় সহস্র-

বৎসর যাবত বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজাদের কঠোর অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াও, ভারতবাসী সনাতন-ধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই!—কঠোর নিষ্পেষণেও সনাতন-ধর্ম্ম ভারত হইতে লুপ্ত হয় নাই। ইহার মূল কারণ, অধিকার ভেদ. অধিকারী অনধিকারী সকল প্রকার লোকই এই বিরাট সনাতন-ধর্ম্ম-পাদপের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত!—যে যত নিম্ন স্তরেই থাকুননাকেন, সনাতন-ধর্ম্ম তাহাকে সেইখান হইতেই ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইবেন!

যে ব্যক্তি 'ক' 'খ' পড়িতেছে তাহাকে বেদান্ত শাস্ত্র বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। যে শিশু এখনও হাটিতে শিখে নাই, তাহাকে দৌড়াইতে বলিলে লাভ কি হইবে? শিশুর আহার পূর্ণবয়স্ক যুবকের আহারের সহিত তুলিত হইতে পারেনা! এক মাপের জামা তৈয়ার করিয়া শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই এক একটী পরিধান করিতে দিলে উহা হাস্যাস্পদই হইবে! এই সকল বিষয় বিচার করিলে, অধিকার ভেদের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিশেষরূপেই উপলব্ধি হইবে!—ইহাই অধিকার ভেদের রহস্য।

ভগবানের সৃষ্টি-লীলার একটী বিচিত্রভাব এই যে, এক ব্যক্তির মুখমণ্ডলের আকৃতি বা রূপের সহিত অপর একটী মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য নাই; একটু না একটু পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে! অনন্তকাল হইতে কোটী কোটী মানবের সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য একটী মুখের সহিত অন্য একটী মুখের মিল নাই!—ইহা মানব-কল্পনার অতীত সৃষ্টিচাতুর্য্য! এই প্রকার যেমন একটী মুখের সহিত অন্য একটী মুখের মিল নাই, সেইরূপ একটী মনের সহিত অন্য একটী মনেরও মিল নাই! মনের মিল কিছুতেই হয় না, এই জন্যই মতভেদের সৃষ্টি! কেননা বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যই জগত সৃষ্টির তত্ত্ব ও রহস্য! তাই আলোর পার্শ্বে অন্ধকার, সুখের পার্শ্বে দুঃখ, ধর্ম্মের পার্শ্বে অধর্ম্ম, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়!

এই প্রকার অসংখ্য মতাবলম্বী মানবগণকে সনাতন-ধর্ম্মের বিরাট দেহে

আশ্রয় দেওয়ার জন্য, অনন্ত মত ও অনন্ত পথের উদ্ভব হইয়াছে। পথ এবং মত অনন্ত হইলেও সকলেরই গতি একমুখী!—সনাতন-ধর্ম্ম সকলকেই এক-স্থানে ও একলক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবে! নদী ও উপনদী অনন্ত হইলেও সকলেরই গতি সাগরমুখী—পরিণামে সকলেই মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। পতিত পাবনী ভাগীরথী শতমুখী হইয়া সাগর-সঙ্গম করিলেও মূলে তাঁহার একটী মাত্রই ধারা! সেইরূপ সনাতন-ধর্ম্মে অনন্ত সাধন পথ দৃষ্ট হইলেও চরম অবস্থায় সকলেই একত্বে উপনীত হইবে!

সাধনার ক্রম। সনাতন-ধর্ম্মের অনন্ত মত ও পথ সমূহ চারিটী সার্ব্বভৌমিক বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা;—

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো, ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো, বহিঃ পূজাঽধমাধমা॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপাসনাই উত্তম ভাব, ধ্যানের ভাব মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম ভাব, আর বাহ্যপূজা অধমাধম ভাব। এখানে "অধমাধম" কথার অর্থ নিকৃষ্ট বা খারাপ নহে; পরস্পর তুলনায় উহা নিম্ন স্তর মাত্র! এই চারিটী বিভাগ পরস্পর বিরোধী নহে, উহারা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যুক্ত, সোপানাবলীর মত পর পর সাধনার চারিটী সুবৃহৎ স্তর মাত্র। সাধকগণ যিনি যে স্তরে আছেন, সেখান হইতেই সাধনার ক্রমোন্নত অবস্থায় উপরের স্তরে আরোহণ করিয়া থাকেন, পরিশেষে সাধনার চরম অবস্থায় সর্ব্বোচ্চস্তরে উপনীত হন! এবিষয়ে একটু বিচার করা যাউক।

যাহাদের চিত্ত জপের সময় স্থির থাকেনা, "প্রত্যাহার" করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হয়, তথাপি জপের বিষয়ে মনঃ সংযোগ হয়না, মন সততই চঞ্চল, তাহাদের পক্ষে সর্ব্ব নিম্ন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; কারণ মনঃ সংযোগ না হইলে, কোন প্রকার সূক্ষ্ম কার্য্য করাই সম্ভব নহে। কতক গুলি বাহ্য আচরণ যদি ভগবৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে ঐ সকল কার্য্যে চিত্ত

সংযোগ নিশ্চয়ই হইবে এবং তদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও চিত্ত-স্থির হইয়া "স্তুতি জপে" অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের অধিকার হইবে! ভগবৎ উদ্দেশ্যে বাহ্যিক সর্ব্ববিধ আচরণই "বহিঃ পূজার" অন্তর্গত। ভগবৎ সাধনার্থে বাহ্যিক স্নান, শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, পুষ্প চয়ন, অন্যান্য পূজোপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি বাহ্য আচরণ চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতার সহায়ক।

এই প্রকারে বাহ্য আচরণ বা বাহ্য পূজা দ্বারা চিত্ত কতকটা শুদ্ধ হইলেই সাধক স্তুতি ও জপের স্তরে উন্নীত হইবে; স্তোত্র পাঠ, ভগবৎলীলা প্রসঙ্গ, নামকীর্ত্তন ইত্যাদি স্তুতির "অন্তর্গত"।

স্তুতি এবং জপে যখন চিত্তস্থির হইবে তখনই ধ্যানের অবস্থা আসিবে—ইহাই তৃতীয় স্তর। স্বস্বরূপে কিম্বা ইষ্টমূর্ত্তিতে চিত্তের একাগ্রতা ও একতানতার নাম ধ্যান; অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্বরূপ বা ইষ্ট চিন্তার নাম ধ্যান। এই ধ্যানের উন্নত অবস্থায় ধ্যাতার নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকেনা! অর্থাৎ আমি দর্শন করিতেছি, এবম্বিধ দ্বৈতভাব লুপ্ত হয়; তখন ধ্যাতা, ধ্যেয় এবং ধ্যান একত্বে বিলীন হয়! তৎপর চরম অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান বিকশিত হয়! অর্থাৎ তখন আত্ম স্বরূপ জ্ঞান কিম্বা ইষ্টমূর্ত্তির স্বরূপ জ্ঞান বিকশিত হইয়া সাধককে পরমানন্দ ও অমৃতত্ব প্রদান করে!—ইহাই সর্ব্বোচ্চস্তর!—ইহাই যোগীর যোগ-সমাধি, ভক্তের সিদ্ধি বা ভগবৎ প্রাপ্তি, আর জ্ঞানীর ব্রহ্ম সদ্ভাব! শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মে অবস্থান করাকে সমাধি বলিয়াছেন * যথা—

"সমাধি ব্রহ্মণি স্থিতিঃ" (গারুড়)।

* কেহ কেহ যোগ সমাধিকে "জড় সমাধি" এবং "ব্রহ্ম সদ্ভাবের" সমাধিকে, "চৈতন্য সমাধি" বলিয়া থাকেন। কারণ যোগ-সমাধিতে দেহটাকে বাদ দিতে হয়, অর্থাৎ দেহটাকে জড়ত্বে পরিণত করিয়া, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই লয় করিতে হয়; কিন্তু "চৈতন্য-সমাধিতে" কিছুই বাদ পড়েনা, দেহ দেহী সমস্তই চিন্ময় বলিয়া অনুভব হয়!!

সনাতন-ধর্ম্মের এই চারিটী স্তরে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্ম প্রণালীই নিহিত আছে ;—এমন উদার ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আর নাই ! ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ঘোর নাস্তিক ব্যক্তিও ইহার আশ্রিত হইলে বিশেষ রূপে উন্নত হয় ! পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমানে খৃষ্ট ধর্ম্মেরই সমধিক প্রভাব, ইহা ভক্তি মূলক ধর্ম্ম ; যুগাবতার যীশুখৃষ্ট বা তদীয় ধর্ম্মমতে এক ব্যক্তির বিশ্বাস না হইলে, খৃষ্টধর্ম্ম আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিবে না ! এমন কি পাশ্চাত্য জগতের কোন ধর্ম্ম দ্বারাই তাহার প্রকৃত শান্তি আসিবে কি না সন্দেহ ! কিন্তু ভারতীয় কোন নাস্তিক যদি বলে, "আমি ঈশ্বর মানিনা, ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই !" তাহাকে জ্ঞানী-গুরু বলিবেন, "বৎস, তোমার ঈশ্বর মানিবার কিম্বা বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু একবার ভাব দেখি, "তুমি আছ কি না" ?—নাস্তিক বলিলেন, "আমিতো আছিই" ! গুরু বলিলেন, "আচ্ছা ভাব দেখি তুমি কে ?—তুমি কেমন—তুমি সাকার না নিরাকার ?" এই প্রকারে বিচার করিতে করিতে, সেই নাস্তিক আত্ম-জ্ঞানে গিয়া পৌছিবে !—আত্ম-জ্ঞান হইলে, ভগবৎজ্ঞান বা ভগবৎ প্রাপ্তিও হইবে ! সুতরাং সনাতন-ধর্ম্ম ঘোর নাস্তিককেও আশ্রয় দিয়া অমৃত ফল প্রদানে চরিতার্থ করিয়া থাকেন !!

সুবিশাল হিমাদ্রির নিম্নদেশ বহু বিস্তৃত হইলেও তাহার শিখরদেশ একটী বিন্দুতে—অর্থাৎ "গৌরিশঙ্করে" (Everest) পর্য্যবসিত ! যে পথ দিয়াই আরোহণ করা যাউকনা কেন, চরম অবস্থায় সকলেই সেই "গৌরিশঙ্করে" যাইয়া পৌছিবে ! সেইরূপ, সনাতন-ধর্ম্মের বিরাট দেহস্থিত স্তরগুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও, চরম অবস্থায় সকলেই একত্বে উপনীত হইবে !—সেখানে কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" !!

প্রতিমা পূজা।

আর্য্য-ঋষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্য প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমা পূজাতে উপরোক্ত সাধনার চারিটী স্তরের সকল ভাবই বিদ্যমান আছে। বহিঃপূজা, স্তুতি জপ, ধ্যান এবং ব্রহ্মসদ্ভাব, এই চারিটী ভাবই প্রতিমা পূজাতে একাধারে সুসজ্জিত। যাহারা প্রতিমা পূজাকে হিন্দুর "পৌত্তলিকতা" বলিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত! জ্ঞানের চরম সীমানায় যাহারা উপনীত হইয়াছিলেন, যাহাদের পরব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতির অমৃতময় ঘোষণাবাণী আজ পৃথিবীর সভ্যজাতি মাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, সেই ত্রিকালদর্শী আর্য্য-ঋষিগণই প্রতিমা পূজার প্রবর্ত্তক! যাহারা ধর্ম্ম বিজ্ঞানের শেষ সীমানায় পৌঁছিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রতিমা পূজার ব্যবস্থাপক! সুতরাং প্রতিমা পূজা "পৌত্তলিকতা" বা "কুসংস্কার" নহে!—ইহাতে গভীর তত্ত্বের সমাবেশ আছে।

হিন্দুর প্রতিমা পূজা ব্রহ্মোপাসনা! হিন্দুগণ প্রতিমাদ্বারা "ব্রহ্মময়" বা "ব্রহ্মময়ীরই" উপাসনা করিয়া থাকেন!—যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বভূতেই বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে ঋষি প্রদত্ত তত্ত্বময় মূর্ত্তিতে পূজা করিলে কি ভগবানের পূজা হইবে না? বিশেষতঃ হিন্দুগণ খড় মাটীর পূজা করেন না, প্রতিমা তৈয়ার হইলে, পূজক তাহাতে পরমাত্মার দেবতামূর্ত্তি কল্পনা করেন, "ইহাগচ্ছ" প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্রদ্বারা আবাহন করতঃ বলিয়া থাকেন, "হে দেব, তুমি এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান কর, তুমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই গমন করিতে পার, আমি ভক্তি স্নেহে ডাকিতেছি, এখানে স্থিরভাবে আমার পূজা গ্রহণ কর।" তৎপর "এই মূর্ত্তিতে তোমাকে দীপবৎ স্থাপন করিলাম" এই বলিয়া পূজক প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। অতঃপর "তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর" এইপ্রকার বিসর্জ্জন মন্ত্রদ্বারা পূজা শেষ করেন! প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত গৃহীতসঙ্কল্প পূজক ব্যতীত অপর কেহর প্রতিমা স্পর্শ করার পর্য্যন্ত অধিকার নাই!

পূজা শেষ হইলে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও সেই মূর্ত্তি জলে নিক্ষেপ করিতে পারে! কেননা হিন্দুগণ জানেন, যাঁহার পূজা হইয়াছিল, তিনি সেভাবে এই প্রতিমাতে এখন আর নাই!

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক উদারচেতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন,—

All worship whether of Natural objects, Images, Persons, was directly or indirectly worship of the Supreme! অর্থাৎ যে কোন পূজা, উহা প্রাকৃতিক কোন বস্তুতেই হউক, অথবা প্রতিমাতেই হউক, কিম্বা কোন ব্যক্তিগত আধারেই হউক, উহা পরমেশ্বরেরই পূজা।*

বিধিমার্গে † প্রতিমা পূজার অন্ততঃ পাঁচটী উপচারের প্রয়োজন হয়, যথা—পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবিদ্য ও গন্ধ। এই পাঁচটীর সহিত আধ্যাত্মিক ভাব জড়িত আছে; পুষ্প—আকাশতত্ত্ব, ধূপ—বায়ুতত্ত্ব, দীপ—তেজতত্ত্ব, নৈবিদ্য—রসতত্ত্ব, ও গন্ধ—পৃথ্বিতত্ত্ব। এই পঞ্চ উপচারে পূজা করার অর্থ পঞ্চতত্ত্ব ভগবানে অর্পণ! প্রতিমা পূজাতে আসন মুদ্রা প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গেরও অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে! এই প্রকার বহু আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা হিন্দুগণের প্রতিমা পূজাতত্ত্বে নিহিত আছে! সুতরাং ইহাকে "কুসংস্কার" বলা মূর্খতা!

মহারাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য উভয়েই এক সঙ্গে মহামায়া দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের ভাব একরূপ না হওয়ায়, দুইজন দুই প্রকার ফল প্রাপ্ত হন! মহারাজা রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করায়, জন্মা-

* সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব দূরকরণার্থে, এই মহাপ্রাণ অমিত তেজা মহাত্মা তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন "সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত, আমাদের ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা কর্ত্তব্য; তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে, এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে।"

† শাস্ত্র-বিধানমত পূজাদি সম্পন্ন করার নাম "বিধি-মার্গ"; আর যাহারা ভালবাসা স্নেহ বা ভাব বিহ্বলতা দ্বারা আপন আপন ইচ্ছামত ভগবৎ উপাসনা বা সেবা করেন, কোন প্রকারবিধিনিষেধের অধীন নহেন! এই প্রকার পূজা বা সাধন-পন্থার নাম "রাগ-মার্গ"।

স্তবে সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন, আর সমাধি বৈশ্য জ্ঞান প্রার্থনা করায়, দেবীর বরে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন ! সুতরাং প্রতিমা-পূজাদ্বারা সকামীগণ সকাম-ফল, আর নিষ্কামীগণ মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকেন !!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "চণ্ডীতে" কেবল "দেহি দেহি" রব ! কিন্তু তাহারা জানেননা যে, ঐ "দেহি" "দেহির" স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইপ্রকার তাৎপর্য্যই আছে। যথা—"রূপং দেহি", ইহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য—স্বরূপ প্রদান কর ! "জয়ং দেহি" ইহার তাৎপর্য্য—মন ও ইন্দ্রিয়াদির উপর বিজয় প্রদান কর। "যশো দেহি", ইহার তাৎপর্য্য আমিত্বের প্রসার হউক (কেননা যশ বিস্তার হয়); "দ্বিশো জহি", ইহার তাৎপর্য্য কাম ক্রোধাদি শত্রু নাশ কর। "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" ইহার তাৎপর্য্য শান্তিদান কর (কেননা শান্তির মত মনের আরাম দায়ক আর কিছুই নাই) "পুত্র দাও" ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞান প্রদান কর (কারণ জ্ঞানই নরক হইতে ত্রাণকারী); "ধন দাও" ইহার তাৎপর্য্য ভক্তি প্রদান কর (কেননা ভক্তির মত অতুলনীয় ধন আর কি আছে) ?—ইহাই নিষ্কামী বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষীগণের "দেহি দেহি" রব ! আর "দেহি দেহির" স্থূল ভাবার্থ সকাম ভক্তগণের জন্য।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া মহাশক্তি দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রতিমা পূজা হিন্দুগণের অতি উত্তম সাধনা। ‡

জগতের অনেকেই ভগবানের ব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু একমাত্র হিন্দুগণই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ব্যাপকত্ব সর্ব্বত্র দর্শন ও অনুভব করেন ! তাই প্রতিমা, ঘট, পট, যন্ত্র, (তন্ত্রমূলক চিত্র বিশেষ), পুষ্প (যন্ত্র-পুষ্প) প্রভৃতি আধারে ভগবানের পূজার ব্যবস্থা আছে !—তাই গুরু পূজা", "কুমারী পূজা", "ষোড়শী পূজা", প্রভৃতি মানব-দেহাধারেও

‡ তৃতীয় অধ্যায়ে সাকার নিরাকার প্রসঙ্গে এ বিষয় কতক আলোচনা করা হইয়াছে।

পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়! এইরূপে হিন্দুগণ সূর্য্যে, চন্দ্রে, অগ্নিতে গঙ্গা যমুনাদি জল প্রবাহে, প্রস্তরময়, দারুময়, মৃন্ময়, ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিতে, তুলসী বিল্বাদি বৃক্ষেতে, গয়া কাশী বৃন্দাবনে, সর্ব্বত্র বিশ্বরূপী ভগবানকে পূজা করেন, দর্শন করেন এবং অনুভব করেন!!

বিশেষতঃ অনেকেই ভগবানের ব্রহ্মরূপ বা অনন্ত রূপ ধারণা করিতে পারেন না, কেননা মানুষের কতটুকু বুদ্ধি যে তদ্দারা সেই অনন্ত পুরুষকে ধারণা করিবে? কতটুকুই বা শক্তি যে তদ্দারা সেই সর্ব্বশক্তিমানকে আয়ত্ব করিবে? সুতরাং কোন একটী ভাব অবলম্বন করতঃ মনোমত কোন আধারে ভগবানের আরাধনা করিলেই আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে! শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।

অর্থাৎ ব্রহ্মের অনন্ত রূপ-কল্পনা, উপাসকদিগের সিদ্ধিলাভের জন্যই হইয়াছে! আবার গীতাতেও ভগবান আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যথা,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"

অর্থাৎ যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি সেইভাবেই তাহাদিগকে কৃপা করিয়া থাকি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন জ্ঞান-পন্থীগণ শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি ভক্তগণের বিগ্রহাদির উপর তাদৃশ শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রদর্শন করেন না। এই কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, কারণ যাহারা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁহারা কি ঐ "শালগ্রাম শিলা" বা বিগ্রহাদিকে বাদ দিতে পারেন? শালগ্রামশীলাদিতে কি ভগবানের অস্তিত্ব নাই? ঐ সকল আধারে পূজা করিলে কি অনন্তের পূজা হইবেনা? সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানীর দৃষ্টি কখনও এতদূর সঙ্কীর্ণ হইতে পারেনা! তবে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইঁহাদের সেবা পূজা না করিলেও, তাঁহারা দেখেন, পাহাড় মাত্রই

"শালগ্রাম"! বৃক্ষ মাত্রই তুলসী! সমস্ত জল রাশিই গঙ্গা বা চিদানন্দ প্রবাহ!! তাঁহারা দেখেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জীব জগত সমস্তই সেই অমূর্ত্তির মূর্ত্তি, সেই অরূপের রূপ—সমস্তই সচ্চিদানন্দময়!!!

সুখের সন্ধান।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে, সম্রাট হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই অভাব-গ্রস্ত! কাহারও অ[illegible] আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না, কাহারও অভাব মিটিতেছে না, [illegible]াপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতেছেনা! অভাবের তাড়নায় সকলেই ব্যস্ত, [illegible]লেই অতৃপ্ত! এই বিশ্বব্যাপী অভাবের মূলে একটী সর্ব্বজনীন ভাব [illegible]খিতে পাওয়া যায়—সকলেই সুখ চায়; ধার্ম্মিক সুখের জন্যই ধর্ম্মাচরণ করে, আবার পাপীও সুখের কল্পনা করিয়াই পাপা-চরণে প্রবৃত্ত হয়। শুধু মানুষ কেন, জড় ও চেতন জগতের জীব মাত্রই সুখের জন্য লালায়িত! সুখ লক্ষ্য করিয়াই সকলে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে!

এক্ষণে সুখ কোথায় অনুসন্ধান ও আলোচনা করা যাউক। পরিবর্ত্তন-শীল জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সুখও সতত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শিশুর সুখ মাতৃ-অঙ্কে, এমন সুখ বুঝি আর কোথাও নাই। মায়ের কোলে লুকাইয়া শিশুর যে তৃপ্তি বা সুখ, তেমন সুখ আর কোন বস্তুতেই সে পায় না! দু'এক বৎসর পরে, সেই শিশুর সুখ আর মাতৃ-অঙ্কে আবদ্ধ থাকেনা, তখন মাতৃ অঞ্চল ধরিয়া থাকাই সুখ—মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকাই সুখ! আরও কিছুকাল পরে সেই বালকের সুখ, মায়ের সহিতও আর জড়িত থাকেনা, তখন বালকের পুতুল খেলাতেই সমস্ত সুখ কেন্দ্রীকৃত,

এমন কি আহারাদি পর্য্যন্ত ভুল হইয়া যায়। অতঃপর পুতুল খেলাতেও আর সুখ থাকেনা। তখন ছবি বা গল্পের পুস্তকেই বালকের সুখ নিবদ্ধ হয়। কিছুদিন পরে সুখ সেখানেও আর আবদ্ধ থাকে না, তখন সমবয়স্ক বিদ্যালয়ের সমপাঠী ও অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে সখ্যতাতেই সুখ বিরাজ করে! এই প্রকারে যুবকের ক্রমশঃ মনে হয়, অর্থোপার্জ্জনেই সুখ, কিন্তু অর্থোপার্জ্জন করাবস্থাতেও তৃপ্তি হয়না! তখন যুবক মনে করে, বিবাহ করিলেই প্রকৃত সুখ হইবে, কিন্তু বিবাহের পরও প্রকৃত সুখোদয় হয় না! তৎপর মনে হয়, পুত্র কন্যা হইলে বুঝি সুখ, কিন্তু তাহাতেও সুখের পরিতৃপ্তি হয় না! কিছুতেই সেই যুবক প্রকৃত সুখ লাভ করিতে না পারিয়া সংসার-মরীচিকাতে জলপানের আশায়, তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ [illegible] করতঃ কেবল দুঃখই প্রাপ্ত হয়।

এই অবস্থাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাহিরের কোন বস্তুতে স্থায়ী সুখ হয় না। তবে সুখের স্থান কোথায়?—বিচার করিলে দেখা যাইবে, সুখ মনের ভিতরে—সুখ আত্মায়! ধন পাইলে মনে সুখ হয় বটে, কিন্তু ধন, সুখ নয়! মনোমত স্ত্রীপুত্র পাইলে, আত্মা সুখী হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীপুত্র সুখ নহে! মনের সুখই সুখ, আত্মার সুখই সুখ! যাহার মনে প্রকৃত সুখ শান্তি আসিয়াছে, তাহার হৃদয়ে চিরবসন্ত বিরাজ করে! মনের অনুকূল হইলে স্ত্রী পুত্রাদি সুখের হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সুখ বলা যায় না; কারণ তাহারাও বিরুদ্ধাচরণ করিলে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে! কিন্তু সুখকে কেহই পরিত্যাগ করিতে চায়না! মন অসুখী হইলে, পূর্ণেন্দু-ধবলা-যামিনী, কোকিল-কণ্ঠ-বিনিন্দিত বামা-কণ্ঠের সঙ্গীত, অতুল ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাস কিছুতেই সুখ হয় না! সমস্তই বৃথা! স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয়জনও কেহ সুখ দিতে পারে না! সুতরাং সুখ বাহিরে নয়।—সুখ অন্তরে, সুখ আত্মায়!—সুখ ভগবানে! শ্রুতি বলিয়াছেন;—

"প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা"

অর্থাৎ আত্মা ধন হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত প্রিয় হইতেও প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম! অতএব আত্মাতেই সমস্ত সুখ কেন্দ্রীকৃত! আত্মা আর আত্ম স্বরূপ শ্রীভগবান অভিন্ন, সুতরাং সর্ব্ববিধ সুখ একমাত্র শ্রীভগবানেই বিরাজমান! বিশেষতঃ ভগবান স্বয়ং সুখস্বরূপ এবং ব্রহ্মানন্দ রসে পরিপূর্ণ। জীব জগতের যাবতীয় সুখ বা আনন্দ কণিকা একমাত্র সেই সর্ব্বাধার হইতেই সতত উৎসারিত! তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র সুখের অনুসন্ধান বি[illegible]! সুতরাং সুখ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানে !!!

বিশ্বব[illegible] পরমান[illegible] কণা জীব হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত আছে, উহাই পাত্রভেদে স্নেহ, [illegible]াসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রণয় প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে! এই ভাবগুলি নির্ম্মল হইলেই অখণ্ডানন্দ লাভ হইতে পারে; প্রাণের ঐকান্তিক টানগুলি ভগবৎ মুখী ও নিঃস্বার্থ হইলেই উহারা প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে। প্রেমের নাম আত্মোৎসর্গ! আত্মেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাকে ভুলিতে না পারিলে প্রেম হয় না। এই প্রেমই সমস্ত সুখের কেন্দ্র—সমস্ত আনন্দের উৎস! আত্মতত্ত্ব ভগবৎতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব সমস্তই প্রেমে পর্য্যবসিত !!

এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপর যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে অবিসংবাদী রূপে প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃত সুখ, ভক্তিতে, জ্ঞানেতে, প্রেমেতে। প্রকৃত আনন্দ আত্মাতে, ভগবানে ও ব্রহ্মে !!

ঐ শোন, তোমাদের আর্য্যঋষিগণ তোমাদিগকে প্রেমামৃত প্রদানে অমর করিবার জন্য সস্নেহে সাদর আহ্বানে, মধুরকণ্ঠে বিজয় নিনাদে বলিতেছেন,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমার শ্রবণ কর ;—

যদি জ্ঞানামৃত পানে অমর হইতে ইচ্ছা কর, তবে জ্ঞানময়, সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, অখণ্ড, চিন্ময়-ভগবৎ সত্তায় চিরতরে ডুবিয়া যাও!—ব্রহ্মানন্দ রস পান করিয়া অমরত্ব লাভ কর !!

যদি প্রেম চাও, তবে ভক্তরঞ্জন, পতিত পাবন, প্রেমময়, মদন মোহন শ্রীভগবানের শ্রীচরণসরোজে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি প্রদান কর !

যদি রূপের অভিলাষ করিয়া থাক, তবে সর্ব্বরূপাধার, করুণা পারাবার শ্রীভগবানে অনন্ত রূপ মাধুর্য্য পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া আত্মহারা হও!—যাঁহার জ্যোতি, চন্দ্র সূর্য্য, অগ্নি তারকা প্রভৃতি [illegible] প্রকাশ করিতে পারেনা!—যেখানে বিদ্যুতের তেজ সম্পূর্ণ [illegible] হইয়া যায়! যাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তিতে সকল জ্যোতি, স[illegible] তেজ দীপ্তিমান হয়!—যিনি সকল রূপের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ, সেই [illegible]রুষোত্তমের স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হও !!!

আর যদি রস বা আনন্দ পাইতে ইচ্ছা হয় তবে সর্ব্ব রসানন্দের আধার শ্রীরাস-রসেশ্বর, রসিক-শেখর নিত্য-নব-নটবর যুগল-কিশোরের অনন্তলীলা রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করতঃ প্রেমামৃত রসার্ণবে অনন্ত কালের জন্য ডুবিয়া অনন্ত মিলনে মিলিত হও!—আর, প্রেম-কারুণ্য কণ্ঠে বল ;—

> "ত্বমেব মাতাচ পিতাত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখাত্বমেব।
> ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥

হে দেবাদিদেব, তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার, সখা তুমিই আমার ধন—আর তুমিই আমার সর্ব্বস্ব!!

সনাতন-ধর্ম্ম অনন্ত-তত্ত্ব, অনন্তভাব, এবং অনন্ত-উপদেশামৃতে পরিপূর্ণ! সকল তত্ত্ব বিবৃত বা আলোচনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। মোটামুটি

ভাবে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় তত্ত্ব, শৃঙ্খলাযুক্ত করিয়া এপর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে মাত্র। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই একটা বিশেষ জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে! এই নব যুগের উদ্বোধনের দিনে, প্রত্যেকে অধিকার অনুযায়ী আপন আপন স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পালন করতঃ যে কোন একটী ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইলে, ইহকালে শান্তি ও পরকালে পরাশান্তি বা পরমানন্দ লাভ হইবে!—ভগবান-পরব্রহ্মের পরম পদে চির বিশ্রাম লাভ করতঃ মানবজন্ম গ্রহণের চরম সার্থকতা হইবে !!!

এক্ষণে, যাহাকে ব্রহ্মা রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ দিব্য স্তবে বন্দনা করিয়া থাকেন, বে[illegible]ষিগণ বেদবেদান্তের ছন্দে সামগান দ্বারা যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া [illegible]রচিত্ত যোগীগণ ধ্যানের অবস্থায় যাঁহাকে মানস নয়নে দর্শন করেন, [illegible] ও অসুরগণ মধ্যে কেহই যাঁহার অন্ত জানেনা, সেই সচ্চিদানন্দময় [illegible]ব্রহ্মের উদ্দেশে প্রণিপাত করতঃ এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম।

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃস্তবৈ
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ওঁ শান্তি শান্তিরেব শান্তি ওঁ

পরিশিষ্ট।

প্রকৃতিপুরুষ ও শিবশক্তিতত্ত্ব।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিই মহ[illegible], মহামায়া এবং প্রকৃতির বিকারেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি। প্রকৃত ত্রিগুণময়ী, আর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় পুরুষ নির্গুণ—প্রকৃতি [illegible]গত সৃষ্টির উপাদান কারণ, আর পুরুষ জগত সৃষ্টি কার্য্যে নিমিত্ত কারণ। সূর্য্যকিরণ যেমন সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে, অথচ নিজে নির্লিপ্ত, আকাশ যেমন সমস্ত বস্তুর অন্তরে বাহিরে মিশিয়া রহিয়াছে, অথচ নিজে নিঃসঙ্গ, প্রদীপ যেমন নাট্য-লীলাদি কার্য্যের সহায়ক বা কারণরূপে বিদ্যমান থাকে—প্রদীপ না হইলে অন্ধকারে নাট্যলীলাদি মোটেই সম্ভব হয় না, কিন্তু নাটক হউক বা না হউক, তাহাতে প্রদীপের যেমন কিছুই আসে যায়না, সেইরূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, সৃষ্টি কার্য্যের একমাত্র কারণ হইয়াও, নিজে নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, এক-মাত্র সাক্ষীরূপে অবস্থিত। যদিও প্রকৃতি ও পুরুষের ভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে কতকটা আলোচনা করা যায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা পরস্পর ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িত। যেমন দুগ্ধ হইতে তাহার ধবলত্ব পৃথক্ করা যায়না, যেমন অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তি পৃথক্ করা যায়না, সেইরূপ শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ—উভয়ে "চনকাকারে" একীভূত হইয়া রহিয়াছেন।

এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বই শিবশক্তিতত্ত্ব। ইঁহারাও অভেদ, তথাপি শিবশক্তির দুই প্রকার ভাব বা তত্ত্ব থাকার, ঐ তত্ত্বগুলি বিকশিত করিয়া দেখাইবার জন্ত, আর্য্যঋষিগণ পুরুষ বা শিব নিম্নে শবাকারে শায়িত এবং তাঁহার বক্ষে মহাকালী নৃত্যময়ী, এই প্রকার তত্ত্ব ও ভাবময় মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন! পুরুষ নির্গুণ, নির্লিপ্ত, নির্বিকার, এই ভাবগুলি দেখাইবার জন্য শিব শবাকারে মৃতবৎ শায়িত রহিয়াছেন! কোন প্রকার গুণে লিপ্ত নহেন, এজন্য তাঁহার অমল ধবল বর্ণ। শক্তি বা মহাকালী একমাত্র ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টি করেন, এজন্য ইঁহার বক্ষই শক্তির সর্ব্ব প্রধান আশ্রয় স্থল!—কেননা, [illegible]তিত শক্তির আধার বা আশ্রয় আর কে হইতে পারে? শক্তি [illegible]ক নৃত্যপরায়ণা!—এই নৃত্যই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার! তাই শা[illegible] বলিয়াছেন—"বহুরূপা প্রকৃতি নর্ত্তকী"! কম্পন দ্বারাই জগত সৃষ্টি হয়, এই কম্পনই শক্তির নৃত্য! শক্তি অনন্তা ও অদ্বিতীয়া এজন্য "দিগম্বরী", কেননা তাঁহাকে ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু কোথায়, যাহা দ্বারা তিনি আবরিতা হইতে পারেন; বিশেষতঃ অনন্তকে কোন প্রকারে বা কোন বস্তু দ্বারাই বেষ্টন করা যায় না! আর তিনি কাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিবেন?—তিনি যে অদ্বিতীয়া! শক্তির কটিদেশে বাহু নির্ম্মিত বন্ধনী—কোন শক্তির খেলা খেলিতে হইলে, কোমরটা বেশ করিয়া বান্ধিতে হয়, আর বাহুবলই প্রকৃত বল, এজন্য মহাশক্তি জগতের সমস্ত বল বা শক্তি একত্র করিয়া কটিদেশে বন্ধনী করিয়াছেন! শ্বেত পীতাদি সমস্ত বর্ণই কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হইয়া, কালরূপ ধারণ করে—মহাকালী সমস্তই আপনাতে বিলীন করেন, এজন্য তাঁহার রং কাল। কাল রংএর অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে; কেহ কেহ বলেন, মানবের চক্ষুদ্বারা আলো দেখিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তাহার অতিরিক্ত আলো হইলেই, উহা অন্ধকার বলিয়া বোধ হইবে! সাধারণতঃ ইহাও দেখা যায় যে, অত্যুজ্জল আলোকের নিকটে সমস্ত বস্তুই

অতএব তাঁহা ছায়ার মত প্রতিভাত হয়। সুতরাং যিনি-অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী, যাঁহার জ্যোতিতে সমস্ত জ্যোতি প্রকাশিত হয়, যিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপা তাঁহাকে কখনও পার্থিব চক্ষু দ্বারা দর্শন করা, কিম্বা পার্থিব রূপ দ্বারা প্রকাশ করা যায়না, এজন্যই মায়ের রং কাল! আবার কাহারও মতে চৈতন্য সাহায্যেই শক্তি প্রকাশিত হন, সুতরাং চৈতন্যের সহিত ভেদভাবের বিচারে, মা কাল-বরণী। মহাশক্তি অনন্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন—ইহাই মায়ের গলে মুণ্ড-মালা! আবার কেহ কেহ বলেন, বর্ণমালার পঞ্চাশৎ অক্ষরই সমস্ত তত্ত্বের মূল—এই মুণ্ডমালাই সেই তত্ত্বের মালা। মা যেমন ভীষণাদপি ভীষণা, আবার প্রেম ও করুণাতেও পরিপূর্ণা, এই ভাবটী দেখাইতে [illegible]য়ের বামদিকের দুই হস্তে একটীতে ভীষণ রক্তাক্ত অসি, অন্যটীতে [illegible] বাহুবলে ভয়ঙ্কর দানবমুণ্ড, আবার দক্ষিণদিকের দুই হস্তে, একটী [illegible] জীবগণকে অভয় এবং অপরটী দ্বারা বর প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করি[illegible]ছেন!—মা সকল ভাবে ও সকল তত্ত্বেই পরিপূর্ণা!!

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব।

ভগবানের শক্তির তিনটী ভাব আছে; একটী সৎভাব (সন্ধিনী-শক্তি)। দ্বিতীয়টী চিৎভাব (সম্বিৎ-শক্তি) তৃতীয়টী আনন্দভাব (হ্লাদিনী-শক্তি)। এই হ্লাদিনী শক্তিই ভগবানের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত স্বরূপ আনন্দ-শক্তি।—ইনিই নিত্য-বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতি রাধারাণী!

শক্তির বিলাস না হইলে, উহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়না। যেমন কোন পলোয়ানের ক্ষমতা অব্যক্ত ভাবে তাহাতে অবস্থান করে সত্য, কিন্তু যখন ঐ পলোয়ান কুস্তিতে কাহাকেও ভূতলে নিপাতিত করিয়া পরাজিত করে, তখন শক্তির বিলাস হেতু সে একটা বিশেষ আনন্দ অনুভব করে! অনেক উৎকৃষ্ট

গায়ক বা বাদক আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত হয় বটে, কিন্তু যখন সে তন্ময়ভাবে গান করিতে বা বাজাইতে থাকে, তখন নিজে অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত হয় এবং অপরকেও আনন্দ প্রদান করে! এই অবস্থায় শক্তির বিলাস হেতু ঐ গায়ক বা বাদকের মনে এমন একটা আনন্দের স্ফূর্তি হয়, যাহার সহিত তাহার পূর্ব্বাবস্থার (শক্তির অব্যক্ত অবস্থা) তুলনাই হইতে পারে না!

ভগবান অনন্ত সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য যদি উপভোগ করিবার কেহ না থাকে, তবে সেই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কি? সেই সৌন্দর্য্য কুৎসিৎ হইলেই ক্ষতি [illegible] ছিল? সেইরূপ ভগবান আনন্দময় বটেন, কিন্তু তাঁহার আনন্দ [illegible] করার জন্য কেহ না থাকিলে,সেই আনন্দ "নিরানন্দ" হইলেই ক্ষতি [illegible]—ইহাই সৃষ্টির মূল কারণ! ইহাই ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছা জাগরণের ক[illegible]—এই ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই ভগবান এক হইলেও বহুরূপে প্রকাশিত [illegible]য়াছেন।

আত্মারাম ভগবান আপনার স্বরূপ আনন্দ-শক্তির সহিত বিলাস করিবার জন্য অর্থাৎ আপনার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি আপনিই উপভোগ করার মানসে, আপনি অভেদ হইয়াও আত্মআনন্দশক্তিকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, এই আনন্দ-শক্তিই ভাবলোকের মহাভাব স্বরূপিণী "শ্রীমতি রাধারাণী"! আর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য ও তাঁহাদের মিলন জনিত আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্যই নিত্য অষ্টসখির অবতারণা!—এই অষ্টসখিই গুণাতীতা সাক্ষীভাব স্বরূপা।

মরজগতের জীবগণকে প্রেমামৃত দানে অমরত্ব প্রদান করিবার মানসে, দ্বাপর যুগে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা হইয়াও ব্রজধামে উভয়-দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া লীলানন্দ করিয়াছিলেন! আর ব্রজগোপীগণ সেই লীলানন্দ সাক্ষীরূপে দর্শন ও আস্বাদন করতঃ জগতে "গোপীভাবে" প্রেম-সাধনার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

প্রেমের পাত্র সুলভ হইলে তাহাতে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয় না, এজন্য স্বকীয়া হইতে পরকীয়া সাধন শ্রেষ্ঠ; কেননা স্বকীয়াভাব সর্ব্বদাই সুলভ, আর পরকীয়া দুর্লভ। এইজন্য রাধাভাবে পরকীয়া-তত্ত্ব এবং নানা-প্রকার বিরহাদিভাব বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়—এইজন্য রাধাভাব পরিশেষে মহাভাবে পর্য্যবসিত!—রাধাভাব প্রেমের অত্যুজ্জল মধ্যমণি!—রাধাভাব "সাধ্য শিরোমণি"!!

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা অনন্ত তত্ত্ব ও অনন্তভাবে পরিপূর্ণ! এই লীলা-ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র!—ইহা ভক্তগণের একমাত্র আস্বাদনীয়!—রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শিব শক্তি বা হর [illegible]রীত বিলাসই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব! অর্থাৎ মহাদেব পার্ব্বতীর মিলনে কি [illegible] আনন্দ অনুভব করেন, তাহা পার্ব্বতী বুঝিতে পারেন না, আর [illegible] মহাদেবকে পাইলে পার্ব্বতীর মনে কি প্রকার আনন্দ হয়, তাহা মহাদেব বুঝিতে পারেন না, এই জন্য উভয়ে উভয়ের আনন্দ আস্বাদনের জন্য, রাধাকৃষ্ণ লীলায় মহাদেব রাধারূপে এবং পার্ব্বতী কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমলীলা মাধুর্য্য প্রকাশ করতঃ জগতবাসীকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন! পূর্ব্ব লীলায় মহাদেব জগদ্‌গুরু, নির্গুণ, আর পার্ব্বতী গুণময়ী; কৃষ্ণলীলায় শ্রীমতি রাধা নির্গুণা, জগতের প্রেমের গুরু, অমল ধবল বরণা (শিবকান্তি), আর শ্রীকৃষ্ণ গুণময়, * কালবরণ (শক্তিও কাল—কালী কালবরণী)। রাধাকৃষ্ণের ন্যায় হরপার্ব্বতীর প্রেমও জগতে অতুলনীয়। মহাদেব জ্ঞান বৈরাগ্যে ও

---

* দৈত্যাদি সংহার কার্য্যই গুণের ক্রিয়া। বিশেষতঃ কৃষ্ণ এবং কালী অভেদ—আমাদিকে শ্রীকৃষ্ণ কালী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন; "যেই কালী সেই বনমালী" ইত্যাদি প্রবাদও প্রচলিত আছে।

জগদ্ধিতার্থে শ্মশানবাসী, আর পার্ব্বতী প্রেমে মহাদেবের চিরসঙ্গিনী !—এই-রূপে তাঁহাদের যুগলমিলনে, জ্ঞানপ্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ !

শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব।

শ্রীরাধাকৃষ্ণই উভয়ে উভয়ের প্রেম একই দেহে আস্বাদনের নিমিত্ত এবং জীবকে প্রেমের সাধন [illegible] দিয়া অমৃতত্ব প্রদান করিবার জন্য, শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে নদীয়াধামে [illegible] হইয়াছিলেন ! শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় প্রেমরসের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ [illegible] প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই প্রেম কিরূপে লাভ করা যায়, এ [illegible] সাধনার সুগম পন্থা না থাকায়, জীবের প্রেম রসের আকাঙ্ক্ষা মিটি[illegible], বরং পিপাসা ক্রমেই আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ; তাই পরম দয়াল প্রেমময় ভগবান, কলির জীবকে প্রেম-পিযুষ প্রদানে ধন্য করিবার জন্য, "অন্তর কৃষ্ণ বহিঃ রাধা" এই প্রকার রাধাভাব কান্তিতে আবরিত হইয়া, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন ! ভগবান গৌরাঙ্গদেব, কখনও রাধাভাব গ্রহণ করতঃ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেন, আবার কখনওবা কৃষ্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া "রাধা রাধা" বলিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন !—কখনওবা "রা" উচ্চারণ করিতে না করিতেই ভাব সমাধি হইয়া যাইত ! "ধা" বলার আর সময় হইতনা !

শিবশক্তির মিলনের চরম অবস্থা যেমন "অর্দ্ধ-নারীশ্বর" সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মিলনের চরম অবস্থাই শ্রীগৌরাঙ্গ !—রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাব-মূর্ত্তি। কোন কোন মহাত্মা গৌরাঙ্গদেবের রসরাজ মূর্ত্তির তত্ত্ব এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন যে, মিলনের অবস্থায় শ্রীমতি রাধা শ্রীকৃষ্ণকে এমন দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন যে, শ্রীরাধার প্রতি অণুপরমাণুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অণু-

পরমাণু অণুপ্রবিষ্ট হইল। * অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভিতরে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। শ্রীমতি রাধার, বাহিরের কান্তিটুকমাত্র রাধাভাব রহিল, আর অন্তর সমস্তই কৃষ্ণময় হইয়া গেল!—ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের রসরাজ-মূর্ত্তি! কথিত আছে যে, এই প্রকার তত্ত্বময় মূর্ত্তি কোন কোন গৌরভক্ত দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

গৌরঅবতারের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে ভগবান অস্ত্রের সাহায্যে অসুর বা পাষণ্ড দলন করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌরঅবতারে পাষণ্ড দলনে, পার্থিব অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় নাই! "অপার্থিব প্রেমই" তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র ছিল!—তিনি প্রেমের বলে—নামের বলে, জগত জয় করিয়াছিলেন। নাম প্রেমের বন্যায় ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, ম্লেচ্ছ যবন, পাপী তাপী, ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞানী স্ত্রী পুরুষ সকলেই একরসে সানন্দে ভাসিয়াছিল!—তখন সকলেই তারস্বরে প্রেমানন্দে বলিতেছিল, "হরের্নামৈব কেবলম" !!

দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব।

এখানে দশমহাবিদ্যা তত্ত্বটী সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

(১) **কালী**—মহাশক্তি, মহাবিদ্যা, অবিনাশী সৎমূর্ত্তি, সৃষ্টিস্থিতি লয় কারিণী ত্রিগুণময়ী, মহাকালের শক্তি অনন্তকাল রূপিণী—কালরূপদার্থ বিলীন কারিণী, সংহারিণী, কার্য্যরূপা প্রকৃতি, অনন্ত বিশ্বমূর্ত্তি (কার্য্য) † আধার মহাকাল। অন্যান্য তত্ত্ব শিবশক্তিতত্ত্বে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

---

* কেননা রাধাকৃষ্ণ উভয়ের দেহই ভাবময়! স্থূলদেহেই এই প্রকার রস-মিলন সম্ভব হয়না, কিন্তু ভাবময়দেহে ঐ প্রকার মিলন স্বাভাবিক।

† কাহারও মতে বাহ্য জগতটা স্থূলই কালীতত্ত্ব, আর অন্তর জগত অর্থাৎ কারণ-জগতটা তারাতত্ত্ব—কালী কার্য্য, আর তারা কারণ, কার্য্য

(২) তারা—চিৎশক্তি, জ্ঞানমূর্ত্তি, তত্ত্বময়ী কারণরূপা প্রকৃতি, অনন্ত দেশমূর্ত্তি—দেশজ পদার্থ বিলীনকারিণী, সংহারিণী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি (কারণ), গলে নরকপালের মুণ্ডমালা (কারণরূপী অনন্তব্রহ্মাণ্ড); নীলবর্ণা, ইঁহার এক নাম নীল সরস্বতী (নীলতন্ত্রে), আধার মহেশ্বর।

কালী ও তারাতে সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে এজন্য তাঁহাদের নাম মহাবিদ্যা। অবশিষ্ট আটটী বিদ্যা কালীতারার অন্তর্ভূক্ত কোন কোন বিশেষ অবস্থা।

(৩) ষোড়শী—আনন্দশক্তি, কালীতারার আনন্দ ভাবটীই ষোড়শী মূর্ত্তি। ইঁহার এক নাম "রাজরাজেশ্বরী" পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চ দেবতা এই ধ্যানে নিমগ্ন, তদুপরি গুণাতীত পুরুষের নাভিকমলে ইঁহার। ষোড়শবর্ষে রমণীর পূর্ণত্ব হয়, এজন্য আনন্দময়ী মা ষোড়শীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মহাশক্তির কোন সময়েই হ্রাস বৃদ্ধি হয়না, এজন্য ষোড়শী চির যৌবনা!—ইঁহার অন্য আর এক নাম "ত্রিপুরা সুন্দরী"।

কালীতারা ষোড়শীই মহাশক্তির সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি (কালী সৎ, তারা চিৎ, ষোড়শী আনন্দ)।

মহাশক্তির দুইটী ভাব আছে, একটী শান্ত বা কোমল ভাব আর একটী উগ্র বা প্রচণ্ড ভাব।

(৪) ভুবনেশ্বরী—মায়ের শান্ত ভাবটীই ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি; ইঁহার আধার বিশ্ব কমল—ইনি "শান্তিরূপা" শান্ত শক্তি।

(৫) ভৈরবী—চণ্ডী শক্তি, ইঁহার ভাব প্রচণ্ড বা উগ্র, ইঁহার সহকারিণী প্রচণ্ডতাময়ী আটটী নায়িকা আছেন, উঁহারাই তন্ত্রোক্ত "অষ্ট নায়িকা" বা "অবিদ্যা"।

সৎ, আর তারা চিৎ (জ্ঞানশক্তি), কালীর গলে রক্তাক্ত সদ্যঃ মুণ্ডমালা, আর তারার গলে নর কপালের মুণ্ডমালা।

(৬) **ছিন্নমস্তা**—ইনি মায়ের বিশেষ [illegible] বা উগ্রমূর্ত্তি —ছিন্নমস্তা প্রচণ্ডা বিশ্ব পালিকা শক্তি! মায়ের অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই বিশ্ব পালনের ভাব বিদ্যমান থাকিলেও, ছিন্নমস্তাতে বিশেষভাবে পালিকা শক্তির বিকাশ হইয়াছে। জগতের প্রত্যেকেই জগৎরূপী বিরাট দেহ হইতেই আহার্য্য বা ভোগ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে!—একটী জীব অপর একটী জীবকে আহার করিয়া পুষ্ট হয়! এ ভাবটী জগতের সর্ব্বত্র সতত ক্রিয়াশীল!—ইহাই ছিন্নমস্তা তত্ত্ব!—ইহাই আপনার মুণ্ড কাটিয়া আপনি রক্ত পান করতঃ ভোগ করা!

ভোক্তা ভোগ্য এবং ভোগ এই তিনটীই [illegible]নের হেতু, একটীর অভাব হইলেই অন্যগুলি বৃথা হয়; এই তিন[illegible] ছিন্নমস্তার তিনটী রক্তের ধারা!, এই জগতে ভোক্তার অভাব নাই—ভোগ্যেরও অভাব নাই, কিন্তু ভোগ না হইলে ভোক্তা বা ভোগ্যের কিছুই [illegible] নাই। এক ব্যক্তি ইচ্ছামত বহু ভোগ্য দ্রব্য আহার করিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি সে পরিপাক করিতে না পারে, তবে তাহার আহারের কোন মূল্য নাই! যেমন কোন রোগীর নিকট ভোগ্য বস্তু যথেষ্ট থাকিতে পারে, সে নিজে ভোক্তাও হইতে পারে, কিন্তু ভোগের অভাব হেতু ঐ সমস্তই বৃথা হয়—ভোগশক্তি হ্রাস হওয়ার নিমিত্ত তাহার দেহেরও পুষ্টি হয় না; সুতরাং ভোগই জগত পালনের মূল হেতু! এই জন্য ভোগধারাই ছিন্নমস্তা নিজে পান করিতেছেন, আর তাহারই একাত্ম দুই শক্তি "ভোগ্য" ও "ভোক্তা" এই দুইটী ধারা পান করিতেছেন!!

জগতের ভোগ শেষ হইলেই প্রলয় হয়, তাই,—

(৭) **ধূমাবতী**—মায়ের মহাপ্রলয় মূর্ত্তি!—ভোগ শেষ হেতু জরাজীর্ণা বৃদ্ধা, লম্বিত পয়োধরা, শুক্ল কেশা, যমের কাকধ্বজ প্রলয়-রথে আরূঢ়! ইনি বিশোদরী, "কুলা" হস্তে বিশ্বের বীজ সংগ্রহ করতঃ আপনাতে

[illegible] ব্রাহ্মণগণ [illegible]

(৮) বগলামুখী—ইনি মায়ের আর একটী প্রচণ্ডভাবের মূর্ত্তি! লা বেদ বিরোধী অসুর বিনাশিনী বা অধর্ম্ম দলনী মূর্ত্তি!

অধর্ম্ম বা অজ্ঞান নাশে ধর্ম্ম বা জ্ঞানের উৎপত্তি, তাই,—

(৯) মাতঙ্গী—অজ্ঞান রূপা-অবিদ্যা নাশিনী, জ্ঞান রূপিণী ।ত্যামূর্ত্তি”! মায়ের করেতে “[illegible]বেক” অসি!

যেখানে অধর্ম্ম এবং অজ্ঞা[illegible] নাশ হইয়া ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়, ইখানে ঐশ্বর্য্যেরও প[illegible]কাশ হইয়া থাকে! তাই,—

(১০) কম[illegible] ঐশ্বর্য্যশালিনী আনন্দদায়িনী মহালক্ষ্মী ত্তি!—স[illegible] মায়ের[illegible]র বিকাশ, তাই কমলা আধার কমলবাসিনী, শ্বব্যাপিনী!

দশবিধা প্রকৃতিশক্তি[illegible] দশমহাবিদ্যা, আর দশমহাবিদ্যার সমষ্টি রূপই পদিক্ ব্যাপী দশভূজা চণ্ডিকা!—ইনিই “সর্ব্বদেবময়ী” ও সর্ব্বশক্তি স্বরূ- ।নী মহাদেবী শ্রীশ্রীভগবতী দুর্গা !!

প্রণব তত্ত্ব।

এই জগতের যত কিছু তত্ত্ব আছে, সমস্তের সমষ্টিই প্রণব তত্ত্ব—জ্ঞানের মস্ত তত্ত্বই প্রণবে পর্য্যবসিত! ওঙ্কারকেই (ওঁ) প্রণব বলা হয়। ‘অ’, উ’, ‘ম’ এই তিনটী অক্ষর যোগে ওঁ হইয়াছে; অকার অর্থ বিষ্ণু বা সত্ত্ব- ।ণাত্মিকা তৎশক্তি বৈষ্ণবী (স্থিতিকারিণী—ইচ্ছা শক্তি), উকার অর্থ ব্রহ্মা ।রজগুণাত্মিকা তৎশক্তি ব্রাহ্মী (সৃষ্টিকারিণী—ক্রিয়া শক্তি); আর মকার র্থ রুদ্র বা তমগুণাত্মিকা তৎশক্তি রুদ্রাণী (সংহারিণী- জ্ঞানশক্তি);

সুতরাং ওঁ অর্থ সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, ত্রিগুণ সমন্বিত পরব্রহ্ম।—আবার ইনিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রণব স্বরূপা পরমা প্রকৃতি। এই প্রণবই বেদের ওঁ উপনিষদের ব্রহ্ম, যোগশাস্ত্রের আত্মা, পুরাণের ভগবান আর তন্ত্রের মহাশক্তি বা মহাকালী। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "ওঁ" "তৎ" ও "সৎ" এই তিনটি ব্রহ্মেরই তিন প্রকার নাম।† শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ত[illegible] জপ স্তদর্থ ভাবনং"

পাতঞ্জল।

তাঁহার (ভগবানের) বোধক শব্দই [illegible]ব, অর্থাৎ ওঁ এই প্রণব মন্ত্রে জপ ও তাঁহার অর্থ চিন্তা বা ধ্যান করাই তাঁ[illegible]বানের) উপাসনা।

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতী[illegible]॥"

তৈত্তিরী[illegible]পনিষৎ।

ওঁ ইহা ব্রহ্ম। ওঁ ইহা এই সমুদায়! [illegible] জড় চেতন, চর অচর জীব জগত সমস্তই প্রণবে ডুবিয়া রহিয়াছে!

গায়ত্রীতত্ত্ব

প্রথমতঃ গায়ত্রী মন্ত্র উল্লেখ করা যাউক ;-

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎওম্"। *

(ওঁ) ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্ম (দেবস্য) দীপ্তি ও ক্রীড়াযুক্ত [দেবতার

† গীতা ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক।

* কাহারও মতে ব্রাহ্মণগণের তিন প্রণব যুক্ত গায়ত্রী, ক্ষত্রিয়ের দুই প্রণব যুক্ত গায়ত্রী এবং বৈশ্যের এক প্রণব যুক্ত গায়ত্রী জপ করা উচিত। বঙ্গদেশে এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি এই দেশে প্রকার নিয়ম আছে।

বিতুঃ) সর্ব্বভূত প্রসবকারী [ব্রহ্মের] (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ এই ত্রিভুবন স্বরূপ, (বরেণ্যং) বরণীয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ও নাশের জন্য উপাস্য, (তৎভর্গ) সেই ভর্গ নামক ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্যোতি, মহি) চিন্তা করি, (যো) যে ভর্গ সর্ব্বান্তর্যামী জ্যোতিরূপী পরমেশ্বর, :) আমাদের, (ধিয়ঃ) বুদ্ধিবৃত্তিকে, (প্রচোদয়াৎ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ র্ব্বর্গে নিরত প্রেরণ বা নিয়োজিত করাইতেছেন ।†

এই গায়ত্রী বেদের জননী স্বরূপা, ও সর্ব্বপাপহারিণী ; ইহা পরম বত্র বস্তু। গায়ত্রী দ্বারা ... ণ ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। যেখানে উপাসনা” আছে ... হ্মের সগুণ ভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান, কারণ গুর্ণ অবস্থার যথার্থ ... । হইতে পারে না ; যাহা বাক্য ও মন বুদ্ধির তীত যাঁহাকে (নিগু ... হাকে) মন বুদ্ধি দ্বারা কিছুমাত্রও চিন্তা করা সম্ভব, তাঁহাকে মন বুদ্ধি দ্বারা কিরূপে উপাসনা করা যাইতে পারে ? তরাং উপাসনা মাত্রই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ! *—গায়ত্রী দ্বারা সগুণ হ্ম ও তৎ উপাসনাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আদ্যাশক্তি গায়ত্রী ই... ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তি সমন্বিতা ; একজ্য ইনি এগুণাত্মিকা প্রণব স্বরূপিণী। তাই প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে গায়ত্রী দবীর তিন প্রকার ধ্যান ও উপাসনার ব্যবস্থা আছে। প্রাতে সূর্য্য মণ্ডল ধ্যবর্ত্তী গায়ত্রী রক্তবর্ণা ব্রাহ্মীরূপা, মধ্যাহ্নে গায়ত্রী কৃষ্ণ বা নীলবর্ণা বৈষ্ণবী রূপা, আর সায়াহ্নে গায়ত্রী শুক্ল বা শুক্লাভ বর্ণা (পীতমিশ্রিত শুক্ল) রুদ্রাণী রূপা।

---

† গায়ত্রীর নানা প্রকার পাঠ, অন্বয় ও ব্যাখা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এখানে প্রধান একটী উল্লেখ করা হইল।

* নির্গুণ অবস্থায় উপাস্য উপাসক বা উপাসনা কিছুই নাই, উহা সম্পূর্ণ অদ্বৈত ভাব ;সমাধির চরম অবস্থায় অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ অদ্বৈতভাবে একমাত্র উহা উপলব্ধি হইতে পারে।

[illegible] রক্তবর্ণকিরণই সৃষ্টির আদি কারণ, এই রক্তবর্ণই সূর্য্যের উত্তেজক শক্তি; জীবশরীরেও কোন প্রকার উত্তেজনার ভাব আসিলে শরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠে এবং নাসিকা কর্ণ ও গণ্ডস্থলে উহার প্রকাশ অনুভব হয়। ধাতু নির্ম্মিত কোন দ্রব্য উত্তপ্ত করিলেও লোহিতবর্ণ রূপ ধারণ করে। সূর্য্যের প্রাতঃকালীন উত্তেজক রশ্মি যেখানে প[illegible] হয়না, সেখানে বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত ভালরূপে উৎপন্ন হয়না। ব্রাহ্মীশক্তি [illegible] রূপে রজগুণান্বিতা হইয়া জগতসৃষ্টির কারণরূপে অবস্থান করেন, এ[illegible] গায়ত্রী প্রাতঃকালে ব্রহ্মাণী রূপা।—প্রাতঃকাল সৃষ্টির সময়।

সূর্য্য মধ্যাহ্নকালীন নীল রশ্মি বা শক্তিদ্বা[illegible] সকলেরই পুষ্টি ক্রিয়া সাধন করিতেছেন, এইজন্য গায়ত্রী এই সম[illegible] শক্তি বৈষ্ণবীরূপা। —মধ্যাহ্নকাল পালন বা পুষ্টির সময়।

অস্তগামী সূর্য্যের কিরণসমূহ সংহারক শ[illegible] সম্পন্ন, তীব্র ও তৃপ্তি বিহীন। একমাত্র এই সময়ের কিরণ যে স্থানে পড়ে, তথায় বৃক্ষলতাদি ভালরূপে জন্মেনা। এই সময় সবিতা আপন তেজরাশি সংহরণ করেন, এই আকর্ষণীশক্তি সংহার রূপিণী। এইজন্য সায়[illegible]কালে গায়ত্রী সংহারশক্তি রুদ্রাণীরূপা।—সায়াহ্নকাল লয়ের সময়।

এই প্রকারে ব্রহ্মশক্তিত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা দ্বারা সাধক উন্নত অবস্থায় উপনীত হইলে, নিশাযোগে একাধারে গায়ত্রী দেবীর ত্রিশক্তির 'নৈস্ত্রৈগুণ্য' সাধনা করিবার অধিকারী হয়েন—গায়ত্রী দেবীর ত্রিশক্তির একাধারে সমন্বয় মূর্ত্তিই প্রণবস্বরূপা তন্ত্রোক্তা মহাকালী *—ইনিই স্বরূপ অবস্থায় সচ্চিদানন্দময়ী, নিরাকারা তুরীয়া স্বরূপিনী, আবার গুণের ব্যক্ত অবস্থায়, আদ্যাশক্তি ত্রিগুণময়ী কালিকা। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে

* এই মতটী সার্ব্বজৌমিক নহে; কোন কোন মহাত্মা এই প্রকার মতের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ল সমস্ত জীবজগত লয় প্রাপ্ত হয়, সেই মহানির্বাণে থাক্ প্রকৃতির ন্যায় ধকের চিত্তও লয় করিয়া মহাকালীর মহাপূজা করার ব্যবস্থা। এইরূপে ধক ব্রহ্মময়ী মহাকালীতে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করতঃ স্বরূপত্ব বা সচ্চিদানন্দ াভ করিয়া থাকেন !!

গায়ত্রী সাধনার সহিত শরীরেরও বিশেষ সম্পর্ক জড়িত আছে। শ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান বর্তমানে একপ্রকার নূতন চিকিৎসা প্রণালী াবিষ্কার করিয়াছেন ; ইহাতে লাল, নীল, শ্বেত, পীত প্রভৃতি নানা-প্রকার বর্ণের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয় এবং তদ্বারাই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে! কিন্তু এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব গায়ত্রীর সহিতই জড়িত আছে। মানবশরীরে কফ (শ্লেষ্মা) পিত্ত ও বায়ু তিনটী প্রধান ধাতু ক্রিয়াশীল, ইহাদের মধ্যে কোন একটীর প্রাধান্য বা ব্যতিক্রম হইলেই, শরীরে কোন না কোন প্রকার "দেহজ" * রোগ উৎপন্ন হইবে। এই কফের বর্ণ শ্বেত, ইনি মহাদেব (এজন্য মৃত্যুকালে সংহারকারী কফ প্রবল হয়)। পিত্তই দেহস্থ ব্রহ্মা—ইনিই পরিপাকাদি অগ্নির কার্য্য করেন! আর বায়ুই দেহের বিষ্ণু—ইনিই দেহ স্থিতির কারণ! গায়ত্রীকে প্রাতে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে নীলবর্ণা, এবং সায়াহ্নে শ্বেতবর্ণা বা পীতবর্ণা † এরূপ ধ্যান করার ব্যবস্থা আছে—রক্তবর্ণ

গায়ত্রী ও দেহরহস্য

* কর্ম্মফল ভোগের জন্য যে সমস্ত রোগ হইয়া থাকে উহারা "কর্ম্মজ" ; ঐ সমস্ত রোগ, ভোগ শেষ না হইলে আরোগ্য হয় না। ধাতুত্রয়ের অসাম্যজন্যে উৎপন্ন "দেহজ" রোগ যথাযোগ্য প্রতিকার হইলেই আরোগ্য হইতে পারে।

† বর্ণ সাতটী হইলেও প্রধানতঃ মূলবর্ণ তিনটী যথা—লাল নীল ও পীত ; অন্য চারিটী মিশ্রবর্ণ, যথা—পীত ও নীল মিশ্রণে হরিৎ বা সবুজবর্ণ, লাল ও নীল মিশ্রণে পাটল বা বেগুনীবর্ণ, লাল ও পীতের মিলনে কমলাবর্ণ, নীল ও মিশ্রবর্ণে ধূসর (কৃষ্ণাভনীল) বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ; আর সকল বর্ণের সমষ্টি শ্বেত অথবা কৃষ্ণবর্ণ। সূর্য্যরশ্মি কোন কাচের মধ্য দিয়া দর্শন করিলে সাতটী বর্ণই দৃষ্ট হইলেও, লাল নীল ও পীতের তিনটী বিকাশ, অতি স্পষ্টভাবেই

ধ্যান দ্বারা পিত্তের ক্রিয়া, নীলবর্ণ ধ্যানদ্বারা বায়ুর ক্রিয়া, এবং শ্বেতাভবর্ণ ধ্যান দ্বারা কফের ক্রিয়া, উন্নত গতি প্রাপ্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মতে প্রাতঃকালে দেহস্থিত কফ প্রবল হয়, মধ্যাহ্নে পিত্ত এবং সন্ধ্যাকালে বায়ু প্রবল হয়; সুতরাং প্রাতে রক্তবর্ণ (অগ্নি বা ব্রহ্মা) চিন্তা দ্বারা কফ দমিত ও সাম্য হয়, মধ্যাহ্নে নীলবর্ণ (বায়ু) চিন্তায়, পিত্ত দমিত হয়; সন্ধ্যায় শ্বেতাভবর্ণ চিন্তায় কফ প্রবল হইয়া বায়ুকে দমন করে। ধাতুত্রয়ের উন্নতিতে ও সামঞ্জস্যে দেহও সুস্থ থাকে। সুতরাং গায়ত্রী সাধন দ্বারা শারীরিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ উন্নতি লাভ করতঃ সাধক পরিশেষে পরমাত্মা ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন !!

যোগ তত্ত্ব।

এখানে যোগ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শিব-সংহিতা, গোরক্ষ-সংহিতা, যোগ-সংহিতা, দত্তাত্রেয়-সংহিতা, হঠযোগ-প্রদীপিকা, যোগবীজ, যোগচিন্তামণি, যোগস্বরোদয় প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য যোগশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তন্মধ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রকাশিত পাতঞ্জল বা যোগদর্শনই ভারতবর্ষে সমধিক সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যদর্শনেরই পরবর্ত্তী অংশ বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না! সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল পরব্রহ্ম আলোচনা না করিয়া, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে বাদ রাখিয়াই, দুঃখ নিবৃত্তি বা মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা

দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কাহারও মতে এই তিনটী প্রধান বর্ণই গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যার ধ্যানের বর্ণ; আর উপরোক্ত সাতটী বর্ণই সূর্য্যদেবের রথের "সপ্ত-অশ্ব" বলিয়া কল্পিত হয়।

।য়াছেন ; * তৎপর মহর্ষি পতঞ্জলি পরব্রহ্মকেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য
া দুঃখনাশ বা মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যকার
লয়াছেন, "জড়দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই দুঃখ-নিবৃত্তি
; আমিত্ব নষ্ট হইলেই মুক্তি হয়" ইত্যাদি; পাতঞ্জল দর্শন এই সমস্তই
[illegible]
হা নষ্ট হয়না, কিম্বা বিস্মৃত [illegible]য়া যায় না; তবে জীবাত্মা, পরমাত্মারই
ংশ, অতএব আমিত্বের না[illegible] বিস্মৃতি করিতে ইচ্ছা করিলে, জীবাত্মা
রমাত্মার যোগ বা মি[illegible] একমাত্র উপায়! সাংখ্য বলিয়াছেন—
পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের [illegible]নে দুঃখ নিবৃত্তি বা মুক্তি হয়," যোগদর্শন
লেন "জ্ঞান, চি[illegible] ধ্যান প্রভৃতিই মুক্তির সোপান!" যোগদর্শনে
াংখ্যের পঞ্চবিংশতি ত[illegible]তীত আরও একটী তত্ত্ব অধিক স্বীকৃত হইয়াছে
—সাংখ্যের চরমতত্ত্ব পু[illegible]। আত্মা, আর পাতঞ্জলের চরমতত্ত্ব পরাৎপর-
ারমেশ্বর বা পরমাত্মা!

যোগশাস্ত্র মতে কৈবল্য[illegible]া নির্ব্বাণ মুক্তিই চরম লক্ষ্য; স্ফটিক যেমন স্বভাবতঃই শুভ্র, সেইরূপ [illegible]াবও স্বভাবতঃই চিন্ময়! কেবল মায়া প্রভাবে, অজ্ঞানতা বশতঃ আমি [illegible]র্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী এরূপ বোধ করে; যোগ সাধন দ্বারা এই অজ্ঞানতা নাশ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইয়া থাকে।

"যোগ" কি?—যোগীপ্রবর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ"; অন্যত্র বলিয়াছেন "চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম

---

* সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিক মতপ্রচার করিয়াছেন, এই মত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে তাহারা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র অবলম্বন করতঃ তাহাদের মতের পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন; কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন; তাহারা এরূপ অর্থ করেন যে, ঐ সূত্রদ্বারা ঈশ্বর নাই, এরূপ অর্থ কখনও হইতে পারেনা, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর বাক্য মনের অগোচর, সুতরাং যুক্তি তর্ক দ্বারা সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারা যায় না।

যোগ"। কোন কোন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করত নিশ্চিন্ত অবস্থায় অবস্থান করার নাম যোগ"। "সহস্রার স্থিত পরম শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগের নাম যোগ"। এতৎব্যতিত বিচার করিলে দেখা যায় যে, যোগ ছাড়া কর্ম্ম নাই!—সাধনা মাত্রই যোগ এজন্যই জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি সমস্তই যোগ বলিয়া উক্ত হয়

যোগের প্রধান অঙ্গ আটটী যথা, যম [illegible] আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। যম নিয়ম সম্বন্ধে [illegible] অধ্যায়ে অলোচনা হইয়াছে। কোন কোন যোগীর মতে যম দ্বারা অন্তর [illegible] আর নিয়ম দ্বারা শরীর শোধন হয়; ষট্ কর্ম্মাদি শোধন প্রণালী [illegible] নিয়মেরই" অন্তর্ভুক্ত আসন কি?—অভীষ্ট চিন্তায় উপবিষ্ট হও [illegible] প্রণালী—দেহের দৃঢ়তা অভ্যাস। প্রাণায়াম কি?—শ্বাস [illegible] গতি বিচ্ছেদ দ্বারা নিঃশ্বাস আয়ত্ব প্রণালী—দেহের লঘুতা অ[illegible]। প্রাণ অপান বায়ুর সংযোগকেও প্রাণায়াম বলা হইয়া থাকে। প্র[illegible]হার কি?—চিত্তৈকাগ্রতা সাধন, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে আনার প্রণালী—ধৈর্য্য বা ধীরতা অভ্যাস ধারণা কি?—লক্ষ্য বা অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত [illegible] করা—স্থিরতা অভ্যাস ধ্যান কি?—একনিবেশ হইয়া লক্ষ্য বস্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিচিন্তন—আত্মাতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষতা অভ্যাস। সমাধি কি?—সর্ব্বপ্রকার বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া অভীষ্ট বস্তুতে তন্ময়তা লাভ করা—নির্লিপ্ততা বা সমতা অভ্যাস।—জীবাত্মা পরমাত্মার অপরোক্ষ মিলন!—ব্রহ্মে অবস্থান। যোগ-শাস্ত্রে মুদ্রা অভ্যাসেরও ব্যবস্থা আছে, উহাদ্বারাও দেহের স্থিরতা লাভ হইয়া থাকে।

যোগতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্ব বিশেষ সম্বন্ধে জড়িত, আবার দেহতত্ত্বের সহিত "নবচক্রের" বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। নবচক্র যথা—(১) মূলাধার চক্র [রক্তাভ বর্ণ চতুর্দ্দল পদ্ম]; (২) স্বাধিষ্ঠান চক্র [অরুণ-বর্ণ ষড়্‌দলপদ্ম] (৩) মণিপুর চক্র [মেঘবর্ণ দশদল পদ্ম]। (৪) অনাহত

চক্র [বন্ধুক পুষ্প সদৃশ দ্বাদশদল পদ্ম], (৫) বিশুদ্ধচক্র [ধূম্রবর্ণ ষোড়শ-দল পদ্ম]; (৬) আজ্ঞা চক্র [শ্বেতবর্ণ দ্বিদল পদ্ম]; (৭) ললনাচক্র [রক্তবর্ণ চৌষট্টি দলপদ্ম]; (৮) গুরুচক্র [শ্বেতবর্ণ শতদল পদ্ম]; (৯) সহস্রার [রক্তকিঞ্জল্ক শ্বেতবর্ণ সহস্রদল পদ্ম—পঞ্চাশ দল পর পর কুড়ি স্তরে সুসজ্জিত]। এই নবচক্র মধ্যে ললনা চক্র ও গুরুচক্র গুপ্তভাবে আছে। আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারিলেই, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি একেবারে সহস্রারে যাইয়া পরম [illegible]বের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। *

যোগ শাস্ত্রে উক্ত হইয় [illegible] যে, মানব-শরীরে সার্দ্ধ তিন লক্ষ নাড়ী বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে [illegible]শটী নাড়ী প্রধান, তন্মধ্যে আবার "ইড়া" "পিঙ্গলা" ও "সুষু[illegible]নটী সর্ব্ব প্রধান। ইড়া (চন্দ্রনাড়ী) গঙ্গা-[illegible]পা, পিঙ্গলা [illegible] সূর্য্য[illegible] [illegible]মুনার[illegible]পা এবং সুষুম্না সরস্বতী রূপা! আজ্ঞা-চক্রে ইহাদের মিলন স্থ[illegible] [illegible]ত্রিকুট বা ত্রিবেণী। মানবশরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় এক ঘণ্টা ইড়া না[illegible]ত (বাম নাসিকায়) এবং একঘণ্টা পিঙ্গলা নাড়ীতে (দক্ষিণ নাসিকায়) শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে, আর বাম হইতে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস পরিব[illegible] হওয়ার সময়ে, অতি অল্পক্ষণের জন্য উভয় নাসিকায় সমান ও মৃদুভাবে [illegible]াস প্রবাহিত হয়, † উহাই সুষুম্নার শ্বাস প্রবাহ; এই প্রকার শ্বাসের অবস্থায় যোগাদি ক্রিয়া করা প্রশস্ত। পদ্মাসন এবং কোন

---

* মানবদেহে এই পদ্ম বা চক্রগুলির স্থান এবং তাহাদের সহিত স্থূল-দেহেরও অত্যদ্ভুত সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় চতুর্থ অধ্যায়ে, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব বিচার প্রসঙ্গে, "জীবদেহ-রহস্য" আলোচনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

† এই প্রকার শ্বাসের গতি সুস্থ শরীরে ও স্বাভাবিক অবস্থায়পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু শরীরে কোন রোগ উৎপন্ন হইলে, এই নিয়ম আর থাকেনা; তখন শুধু বাম নাসিকায় অথবা দক্ষিণ নাসিকায় অধিকাংশ সময়ে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে। এইজন্য স্বরোদয় যোগ-শাস্ত্র মতে, অসুখের অবস্থায় যে নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রবাহিত হয়, ঐ নাসিকাটী পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অথবা

কোনমুদ্রার ফলে শ্বাসের গতি আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুষুম্নায় প্রবাহিত হয়।

সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে গুহ্য দেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত লম্বিত ভাবে অবস্থিত ; ইহার অভ্যন্তরে "বজ্রা" নামক একটী নাড়ী আছে, বজ্রার অভ্যন্তরে "চিত্রা" নামক একটী সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। এই চিত্রা নাড়ী দ্বারাই নয়টী পদ্ম বা চক্র মাল্যের ন্যায় [illegible]জ্জিত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে ! চিত্রানাড়ীর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যো[illegible]র্ম্ময় স্থানই ব্রহ্মনাড়ী ; উহারই নিম্ন দিকের সূক্ষ্ম রন্ধ্রটী (ইহাই ব্রহ্মদ্বার) [illegible]লকুণ্ডলিনীশক্তি স্বীয় মুখদ্বারা বন্ধ করিয়া মুলাধার স্থিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে স[illegible]লয়াকারে বেষ্টন করতঃ নিদ্রিতা আছেন। কুলকুণ্ডলিনীকে চৈতন্য [illegible]নাড়ীতে প্রবেশিত করাইয়া, ক্রমশঃ চক্রগুলি পরিভ্রমণ ও উর্দ্ধে [illegible] পূর্ব্বক [illegible]স্রারে পরম শিবের সহিত মিলন করাই যোগের সর্ব্বপ্রধান [illegible]

যোগ প্রধানতঃ চারি প্রকার, যথা—"[illegible] যোগ" "রাজ যোগ", "লয় যোগ" এবং "মন্ত্র যোগ"। [১] হঠযোগ—[illegible]হ" অর্থ সূর্য্য (প্রাণবায়ু) "ঠ" অর্থচন্দ্র (অপান বায়ু) এই উভয়ের মি[illegible]ই হঠযোগ ; অর্থাৎ প্রাণ অপান বায়ুর সংযোগই হঠযোগ। যোগীবর [illegible]রক্ষনাথ, মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রভৃতি এই যোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে, হঠ যোগের তাদৃশ সমাদর দেখা যায় না। যোগোক্ত "ষট্ কর্ম্মাদি" শোধন প্রণালী. এই হঠ যোগের অন্তর্গত। ষট্ কর্ম্ম যথা—(১) ধৌতি—শরীরের বাহ্য এবং অভ্যন্তর ধৌত করতঃ শোধন করা (২) বস্তি—গুহ্যদেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা শোধন ; (৩) নেতি—সূত্র চালনা দ্বারা নাসিকা শোধন। (৪) নৌলিকী—উদর সঞ্চালন দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি করতঃ নাড়ী শোধন।

অন্য কোন উপায়ে বন্ধ করিতে পারিলে, কিম্বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা ঐ প্রকার শ্বাসের গতি ফিরাইয়া অপর নাসিকা দ্বারা প্রবাহিত করাইতে পারিলে, যে কোন রোগ আপনা হইতে আরোগ্য হয়।

(৫) ত্রাটক—নির্নিমেষ নয়নে কোন সূক্ষ্মবস্তু দর্শন দ্বারা চক্ষু শোধন। (৬) কপাল ভাতি—বায়ু ও জল নাসিকারন্ধ্রে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা শোধন (ইহাতে কফদোষ নষ্ট হয়)।

[২] রাজ যোগ মন ও বায়ু স্থিরকরাই এই যোগের প্রধান সাধনা, এজন্য ইহাতে প্রাণায়ামের বিশেষ আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। কুলকুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করিয়া, ষট্‌চক্র ভেদ [illegible] ও এই যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। গুরু দত্তাত্রেয় প্রভৃতি এই যোগে [illegible] সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন!

[৩] লয়যোগ—[illegible] নবচক্রে, অথবা ষোড়শ আধারে * কিম্বা যে কোন আধারে চি[illegible] রিয়া, তাহাতে একতানতা ও তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারিলে [illegible] যোগে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও বহু মহা[illegible] যোগে সিদ্ধ হন।

[৪] মন্ত্রযোগ—[illegible]প করিতে করিতে মনের যে লয় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম "মন্ত্র[illegible]।" দেবতা আরাধনা দ্বারা মনোলয় হইলে, উহাও মন্ত্র যোগ বলিয়া কথি[illegible] হয়। মহর্ষি কশ্যপ, ভৃগু, জমদগ্নি প্রভৃতি ইহার উপদেষ্টা।

যোগ সাধন দ্বারা নানাপ্রকার বিভূতি ও "অষ্ট-সিদ্ধি" লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল বিভূতি যোগসিদ্ধির বিশেষ বিঘ্নকর, কারণ যাহারা এই সকল বিভূতি বা ক্ষমতা লাভ করতঃ অহংকারে আত্মবিস্মৃত হন, কিম্বা শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহারা মূল বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যোগভ্রষ্ট হয়েন। "অষ্ট সিদ্ধি" যথা—(১) অনিমা (ইচ্ছামত ছোট হওয়া) (২) লঘিমা (ইচ্ছামত লঘু বা পাতলা হওয়া—খেচরত্ব লাভ) (৩) মহিমা (ইচ্ছামত বড় হওয়া) (৪) প্রাপ্তি (যথেচ্ছা গমন) (৫)

* ষোড়শ আধার যথা—দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ, পাদগুল্‌ফ, গুহ্যদেশ, লিঙ্গমূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠকূপ, জিহ্বাগ্র, তালুমূল, নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য নেত্রাধার, ললাট, মূর্দ্ধা ও ব্রহ্মরন্ধ্র (সহস্রার)। দন্তাধার,

প্রাকাম্য (দূরস্থিত বস্তু নিকটে আনয়ন) (৬) বশিত্ব (ত্রিভুবন, জীবমাত্রকেই বশীভূত করণ) (৭) ঈশিত্ব (ভৌতিক সর্ব্ববিধ পদার্থের উপর প্রভুত্ব) (৮) কাম বসায়িত্ব (ইচ্ছামত যে কোন পদার্থে যে কোন শক্তি প্রয়োগ)!

ইতি পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, মানবদেহ এক একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড!—ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্বই দেহ-ভাণ্ডে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান আছে! সুতরাং যোগ সাধন দ্বারা তন্ময়ত্ব বা সমাধি লাভ [illegible] হলে, জ্ঞানের সর্ব্ববিধ তত্ত্বই সাধক মানস নয়নে দর্শন করিতে পারেন!—স[illegible] তত্ত্বই তাঁহার করতল গত হয়!—এইরূপে সাধক পরমানন্দ ও অমৃতত্ব [illegible] করিয়া কৃতকৃতার্থ হন!! তাই ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়[illegible]গী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী হইতেও শ্রে[illegible] হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও"!* শাস্ত্রকারও আনন্দে ঘোষণা করি[illegible]!—

"যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞা[illegible]

যোগ সাধন দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে[illegible]

কর্ম্ম-রহস্য।

কর্ম্ম রহস্য বড়ই জটিল, কর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব জগতে ক্রিয়াশীল! কেহই কর্ম্ম ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না; প্রকৃতির গুণই প্রত্যেক জীবকে সতত কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে। কোন কোন ঋষি কর্ম্মের অদ্ভুত শক্তি দর্শনে "কর্ম্মকেই" ভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন! কর্ম্ম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে হইতে পারেনা, তবে প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সমন্ধেই এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ইহ জন্মে ভোগ হইবেনা, জন্মান্তরে ভোগের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, উহাদের নাম "সঞ্চিত" কর্ম্ম। যে

* গীতা ৬ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক।

"প্রারব্ধ" কর্ম্ম। আর যে সকল নূতন কর্ম্ম ইহকালের কর্ম্মদ্বারা সঞ্চয় জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-ফল ভোগের জন্য এই দেহ ধারণ অর্থাৎ জন্ম হইয়াছে, করা হইতেছে, উহাই "ক্রিয়মাণ" বা "বর্ত্তমান" বা "আগামী" কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম-চক্রের আবর্ত্তনেই মানবগণ জন্ম-মৃত্যুর অশেষ ক্লেশদায়ক পথে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিয়া থাকে।

প্রারব্ধ-কর্ম্ম নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়, ইহা কেহ খণ্ডাইতে পারেনা। এমনকি জীবন্মুক্ত হইলেও [illegible] ব্ধ-ভোগ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়।* অন্যান্য কর্ম্ম ভগবৎকৃপা অথবা [illegible] দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। যথা ;—

প্রারব্ধ [illegible] ভুক্তে শেষ জ্ঞানেন দহ্যতে।
অনারব্ধং [illegible] নন নির্বীর্য্যং ক্রিয়তে তথা॥ —শ্রুতি

প্রারব্ধ কর্ম্মের ভো[illegible] শেষ হইয়া থাকে, অবশিষ্ট কর্ম্ম সকল জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা ভস্মীভূত হয়, অর্থ[illegible] অনারব্ধ কর্ম্ম সকল জ্ঞানপ্রভাবে নির্বীর্য্যতা হেতু তাহাতে আর অঙ্কুর উৎ[illegible] হয় না।

ভগবান গীতাতেও [illegible]লিয়াছেন, "প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যেমন কাষ্ঠ সমুদায় ভস্মাবশেষ করে, সে[illegible] ব জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম (প্রারব্ধ ব্যতীত) ভস্মীভূত করিয়া থাকে।‡

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভোগদ্বারা "প্রারব্ধ" কর্ম্ম নষ্ট হয়, জ্ঞানাগ্নিতে "সঞ্চিত" কর্ম্ম নষ্ট হয়, আর "আগামী" কর্ম্ম জ্ঞানপ্রভাবে স্পর্শ হয় না।

কর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। জনৈক ব্যাধ (তীরন্দাজ) তীরধনুক হস্তে দণ্ডায়মান ; সে একটী তীর ছাড়িয়া দিয়াছে,

---

* সাধনার প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম্ম নিস্তেজ হইতেপারে, কিন্তু কর্ম্মফল একেবারে খণ্ডন হয়না, কিছু না কিছু ফলভোগ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়।

‡ গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক।

ব্যাধের দৃষ্টান্ত

আর একটী ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ সে ধনুকে তীর সংযোজন করতঃ তাহা নিক্ষেপার্থে গুণে টান দিয়াছে; তাহার পৃষ্ঠে তুণীরের মধ্যে কতকগুলি তীরও সঞ্চিত আছে। এক্ষণে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সে তীরটী ছাড়িয়া দিয়াছে, উহাতে ব্যাধের কোন হাত নাই, উহা কোন না কোন ফল প্রসব করিবেই করিবে! —ইহাই "প্রারব্ধ" কর্ম্ম! ইহাতে কাহার[illegible] হাত নাই! ব্যাধের পৃষ্ঠস্থিত তূণীর মধ্যস্থিত তীরগুলিই "সঞ্চিত" কর্ম্ম [illegible] ইচ্ছা করিলে ঐগুলি নষ্ট করিতে পারে। আর যে তীরটী সে ছাড়িবার উ[illegible] করিয়াছে, উহাই 'ক্রিয়-মাণ' কর্ম্ম। ব্যাধ ইচ্ছা করিলে বাণ নিক্ষেপ ব[illegible]পারে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ভাবী কর্ম্মফল নষ্ট করিতে পারে।

উর্ণনাভের ন্যায় জীবগণ আপনার কর্ম্মদ্বারা [illegible]হি বদ্ধ হইয়া, অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে! উন্মত্তের ন্যায় অনন্ত[illegible] না কামনাদ্বারা নিজকে জড়াইয়া ফেলিয়া, তাহার বিষময় ফল জন্মজ[illegible]রে ভোগ করিতেছে! সুতরাং "বর্ত্তমান" কর্ম্ম এরূপভাবে করা উচি[illegible] যাহাতে আর কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ না হইতে হয়! সকাম কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ[illegible]ভোগ করাও, সোনার শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন দশামাত্র! কারণ ভোগান্তে আবা[illegible] জন্ম অবশ্যম্ভাবী সুতরাং কর্ম্ম এরূপভাবে করা উচিত যে, তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হইতে পারে! যে ভারতবর্ষের একজন স্ত্রীলোকও বিষয় সম্পদের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করতঃ স্বীয় পতিকে বলিয়াছিলেন, "যাহাদ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিব, তাহাদ্বারা আমি কি করিব?"* সেই ভারতবাসীর

---

* যোগীবর যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করার মানস করিয়া তাঁহার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নাম্নী পত্নীদ্বয়কে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, মৈত্রেয়ী স্বীয় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহাদ্বারা তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন কিনা, তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "তাহা কিরূপে হইবে?" তখন মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন,—

আজ কি শোচনীয় অধঃপতন ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়! ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—"কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই!" সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম-ফল ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করতঃ তাঁহারি সংসারে সংসারী হইয়া নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে গুণক্ষয়ে ইহকালে শান্তি ও পরকালে পরাশান্তি ও পরমানন্দ লাভ হইবে !!

শাক্ত ও বৈষ্ণব মিলন।

শাক্ত এবং বৈষ্ণ[illegible] ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়, অ[illegible] ইহার মূল কারণ! প্রকৃত শাক্ত এবং প্রকৃত বৈষ্ণবে কোন[illegible]। শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত[illegible] বিষ্ণু এ[illegible]াশক্তি কালিকাও অভিন্ন, ইহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিশেষ ভাবেই পতি[illegible]ইয়াছে; কেননা যদিও ভগবান বিষ্ণুই মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়াছেন, [illegible]াপি—উহা বিষ্ণুশক্তি কিম্বা বিষ্ণুরূপা কালিকারই কার্য্য বলিয়া গণ্য করা [illegible]য়াছে! কারণ শাস্ত্রেই আছে যথা,—

"একৈবশক্তিঃ প[illegible]মেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে।
ভোগে ভবানী [illegible]রুষেষু বিষ্ণুঃ কোপেচ কালী সমরেচদুর্গা ॥

পরমেশ্বরের একমাত্র শক্তিই, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষ্ণু, কোপে কালী এবং সমরে দুর্গা—কার্য্যকালে এই চারিরূপে বিভক্ত হন। সুতরাং বিষ্ণু ও কালীতে কোনও ভেদ নাই—উভয়েই এক এবং অদ্বিতীয়!

বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ যাহাকে লক্ষ্য করেন, শাক্তগণও সেই অদ্বিতীয় বস্তুই লক্ষ্য করিয়া থাকেন; সুতরাং শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে ভেদভাব অজ্ঞানতার পরিচায়ক।

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"
অর্থাৎ যাহাদ্বারা আমি অমরত্ব বা অমৃতত্ব লাভ না করিব, তাহা লইয়া আমি কিকরিব? অতঃপর মৈত্রেয়ী—"ব্রহ্মবিদ্যা" প্রার্থনা করিয়াছিলেন!

একটী প্রবাদ আছে, "শিব ও রামে কোন ভেদ নাই, তাঁহারা একাত্মা এবং অভেদ, তবে যত ভেদভাব যত মারামারি, কাটাকাটি, শিবানুচর ভূত প্রেত, আর রামানুচর বানরগণের মধ্যে!" আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে, মূলে বা সাধনার উচ্চ অবস্থায় কোনও ভেদ নাই, কিন্তু নিম্ন স্তরেরই যত গোলমাল—যত ভেদ ভাব!

শাস্ত্রে আছে, যাহারা হরি, ঈশান গঙ্গা এবং দুর্গাতে ভেদ বুদ্ধি করেন তাহারা নিরয়গামী হন। যথা,—"গঙ্গা দুর্গা হরী[illegible]নং ভেদকৃন্নারকী তথা"

কেহ কেহ শাক্ত ও বৈষ্ণবকে সাধনার প[illegible] দুইটী অবস্থা বা স্তর রূপেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন! তাঁহাদের মতে য[illegible]নব মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করিতে না পারে, যতদিন তাহাদের [illegible] পরিচালিত হয়, ততদিন তাহারা শাক্ত।—যতদিন পর্য্যন্ত [illegible]ন্দ্রিয়াদিকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা বা সাধনা করা হয়, ততদিন তাহার[illegible]! আর যখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি জয় হইয়া মানব জিতেন্দ্রিয় ও জীবন্মুক্ত [illegible] লাভ করে, তখন তাঁহারা বৈষ্ণব পদ বাচ্য! এবিষয়ে তাহারা শিব ও [illegible]ক্ষায়ণী সতীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। শিব আপন শক্তিকে বশে [illegible]খিতে পারেন নাই— সতী শিব-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, দক্ষ-যজ্ঞে গমন ক[illegible] শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, সতীর জন্য শিব উন্মত্ত প্রায় হইলেন, সতীকে কাঁধে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন, পরিশেষে তিনি যোগাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন। এদিকে সতী মেনকা গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু শিবের ধ্যান আর কিছুতেই ভঙ্গ হয়না। সকলে পরামর্শ করতঃ "মদন" দ্বারা শিবের ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা করিলে, শিব-কোপে মদন ভস্মীভূত হইল, তখন গৌরিরূপা প্রকৃতি, শিবের দাসীরূপে আত্ম-সমর্পন করিলেন। অর্থাৎ যতদিন শিব, শক্তির জন্য লালায়িত ছিলেন, ততদিন তিনি শাক্ত, কিন্তু যখন মদন ভস্ম হইল (জিতেন্দ্রিয় হইলেন), আর প্রকৃতি আত্ম-সমর্পন করিলেন (শক্তি-জ্ঞান লাভ হইল) তখনই শিব পরম বৈষ্ণব হইলেন!

যে ভাবই গ্রহণ করা যাউক না কেন, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কোন প্রকার ভেদভাব থাকা কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ নিম্নে বিবৃত হরিনাম তত্ত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে সর্ব্ববিধ ভেদভাব মিলনে পর্য্যবসিত হইবে!

হরিনাম তত্ত্ব।

হরিনাম যুগযুগান্তর হ[illegible] [illegible]ই তারক-ব্রহ্মনাম রূপে জীবকে মুক্তি[illegible] প্রদান করিয়া আসিতে[illegible] বর্ত্তমান যুগেও করুণা সাগর, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনা[illegible] [illegible]ন্যায়, শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু অহিন্দু সকলকেই প্রেমে ভাসাইয়া[illegible] [illegible]রিনাম অপার্থিব চিন্ময়বস্তু!—হরিনাম ব্রহ্মনাম!!

ভগবান [illegible] শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই হরিনাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়, সুতরা[illegible] [illegible]হা যে [illegible] [illegible]দের পরম আদরের বস্তু, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর হরিনামটী [illegible]ণ করা যাউক।

হরিশব্দটীতে হব [illegible] ইকার এবং রকার এই তিনটী বর্ণ পাওয়া যায়, "হকার" শব্দের অর্থ ম[illegible]দেব বা পুরুষ, "ইকার" অর্থ শক্তি বা প্রকৃতি আর "রকার" অর্থ রমণ [illegible] মিলন। সুতরাং এই তিনটী যোগ করিলে, হরি শব্দের এইরূপ অর্থ [illegible] যে শিবশক্তির মিলন বা প্রকৃতিপুরুষের মিলনই হরি!! সুতরাং [illegible], শৈব বা শাক্তদিগেরও অভীষ্ট দেবতা!—আবার ব্রহ্মবাদীদিগেরও প্রকৃতিপুরুষাত্মক ব্রহ্ম! এইজন্যই হরিনাম ভারতীয় "ব্রাহ্ম-সমাজও" গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন, বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, মহাভারতে, আদি অন্তে মধ্যে, সর্ব্বত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।*

আবার ভাগবত পুরাণেও তিনি বলিয়াছেন "সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ ভগবান ঈশ্বরের হরিনামটি সর্ব্বজীবের শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কারণ উহা মোক্ষার্থীগণের মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ!"—"হরি যাহার কর্ণ-পথে প্রবেশ করেন নাই, সে ব্যক্তি পশুর সমান †"

---

* বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

† শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্দ ২।৩৬ শ্লোক এবং ৩।১৯ শ্লোক।

হরিনামের আরও একটী গূঢ় রহস্য আছে। হরিনাম কেবল যে অর্থে এক তাহা নহে, ইহা শাক্তগণের "বীজমন্ত্রের" সহিতও এক হইয়া রহিয়াছে! শাক্তগণের মহাশক্তি বা মহামায়া বীজ, "হ্রীং" আবার ভুবনেশ্বরী বীজও "হ্রীং"; এই "হ্রীং" আর "হরি" মূলে এবং বীজে একই পদার্থ!! হ্রীং বীজটী বিশ্লেষণ করিলেও হরিনামের মত একই অর্থ ও একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—"হ্রীং" বীজটীতে হকার, ঈকার এবং রফলা বা রকার আর নাদবিন্দুর যোগ, দেখা যায়; সুতরাং ইহাদ্বারাও শিবশক্তির মিলন বা প্রকৃতিপুরুষাত্মকব্রহ্মই অর্থ হয়।—অতএব [illegible] এবং হরিনাম একই বস্তু! বিশেষতঃ "হ্রীং" বীজটী তাড়াতাড়ি জপ [illegible] হরিতেই পর্য্যবসিত হয়! সুতরাং শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণের ভগবান যে [illegible] এক তাহা নহে, মূলে, বীজে, এবং নামেও এক!! এক্ষণে বিচা[illegible] শাক্ত-বৈষ্ণবের প্রেমের মিলন হয় নাকি?—প্রেমাবতার মহাপ্রভু [illegible] কলকে এই অতুলনীয় হরি নাম দ্বারা চিরমিলনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন [illegible]

এক্ষণে, একবার এস জগৎবাসী!—আমরাও [illegible] দয়ার অবতার প্রেমের ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ভেদভাব অতল[illegible] বিসর্জ্জন করতঃ সকলে মিলিয়া প্রেমকারুণ্য কণ্ঠে বলিতে থাকি "হরিবোল [illegible] হরিবোল!! হরিবোল!!!"—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্!!"

এক্ষণে সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বার্থপ্রদায়িনী ভব-দুঃখ হারিনী, জগদম্বা মহামায়া ভবানীর অতুল রাতুল অভয়চরণ-সরোজে প্রণিপাত করতঃ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মদোচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে॥"
হরি ওঁ তৎসৎ ওঁ!

সম্পূর্ণ